KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : নরেন্দ্র দেবগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 8/3 Award Issue 9/2 9/4	Year of Publication : Aug 1985 Oct 1985 May 1986 Aug 1986
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : নরেন্দ্র দেবগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

৩৩

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

সৌজন্য সংখ্যা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বর্ষা ১৩৯৩

বিভাব

বিশেষ ক্রোড়পত্র

ঘরের ছেলে বাইরে | ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ১
ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে | শ্যামলী মুখোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ৬৯

প্রবন্ধ

কবি ও সন্ন্যাসী : রবীন্দ্র জীবনীর খসড়া | শিশিরকুমার দাশ ১

বিশেষ রচনা

ক্রান্তদর্শী : আমার সাম্প্রতিকতম উপন্যাস | অন্নদাশঙ্কর রায় ৩৩

গল্প

ক্ষিধেতেষ্টার যোগফল | শৈবাল মিত্র ৩৯

সম্পাদকমণ্ডলী
পবিত্র সরকার
দেবীপ্রসাদ মজুমদার প্রদীপ দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর
৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস | কলকাতা-১৭

সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ/অনুপ রায়
অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যনারায়ণ প্রেস, ১, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

মণীন্দ্রলাল বসু

মণীন্দ্রলাল বসুর মৃত্যু প্রকৃত অর্থই বাংলা সাহিত্যে একটি অধ্যায়ের শেষ সূচিত করল। বিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে ইউরোপের একটা বিশেষ প্রভাব ছিল। সেদিন স্যুট হামসুন হেলমা লেগারলক ফ্লবেয়ার প্রভৃতি লেখকরা বাঙালী পাঠককে আকৃষ্ট করেছিলেন। সাহিত্যিকরাও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেদিনকার পৃথিবীতে যানবাহন খুব উন্নত ছিল না। ভাষার ব্যবধান ছিল একটা বিরাট অন্তরায়। তবু উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগের দিনের চেয়ে তখনকার পৃথিবী অনেকটা বেশি একনীড় ছিল।

এদেশে বিশেষত বাঙালী সাহিত্যিকরা তখন গভীর অধ্যয়নমনস্ক ছিলেন বিদেশী সাহিত্যের। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে তারও আগে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিশ্বের লেখকদের সঙ্গে বাঙালী পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন। কিছু ফিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে আজকের সাহিত্যিকরা মার্কিন চটজলদী লেখকদের নিকট আত্মীয়। অন্যদের সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ কম।

মণীন্দ্রলাল সেই গোষ্ঠীর শেষ প্রতিনিধি। জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান, সুইডিশ সাহিত্যের সঙ্গে মণীন্দ্রলাল সুপরিচিত ছিলেন। শেষদিন পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তাঁর নিজস্ব গৃহটি ছিল পাঠকদের মুগ্ধ বিস্ময়ের জায়গা। তাঁর ঈর্ষণীয় গ্রন্থাগার তাঁর বহুমুখী রুচির সাক্ষ্য বহন করে। মণীন্দ্রলাল বসুর মৃত্যুতে কলকাতা দীনতর হল।

মণীন্দ্রলাল বসুর নাম বর্তমান সাধারণ পাঠককুলের কাছে অজ্ঞাত। অথচ একদিন মণীন্দ্রলাল অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর জীবনায়ন, রমলা, সহযাত্রিনী প্রায় রবীন্দ্রতুল্য পাঠক সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর রোমান্টিকতা বাংলার যুবক যুবতীদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষ করে উল্লেখ্য মণীন্দ্রলাল বসুর নায়িকারা। তাঁরা প্রায় সবাই বিদুষী, একটু সুদূর, কোন এক

অজ্ঞাতকারণে তাঁরা হেলিয়োট্রোপ রঙের শাড়ী পরতে ভালবাসেন। তাঁদের আকর্ষণ তৎকালীন বাঙালী যুবকদের কাছে ছিল অতি প্রবল। এঁরা আয়েষা হননি, রাজলক্ষ্মী নন, এমনকি সুচরিতাও হতে পারেননি। তাঁদের ভারতীয় বলে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। কিন্তু রমলা, মাধবী, ইউরোপীয়-ভারতীয়।

মণীন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে যে হাওয়া ইউরোপ থেকে এনেছিলেন সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। চল্লিশের দশকের আগে থেকেই বাঙালী পাঠক পথের পাঁচালীতে মজেছে। অন্যদিকে কয়লাকুঠির বিবরণ আর পদাতিক সঙ্গীত বাঙালীকে তখন ঘরের বাইরে টানছে। এই দোটানার মধ্যে মণীন্দ্রলাল তাঁর লেখা হঠাৎই বন্ধ করে দেন।

তারপর যেটা হল সেটা খুবই আশ্চর্যের, আবার খুবই স্বাভাবিক। খুব সহজেই বাঙালী পাঠক ভুলে গেল মণীন্দ্রলাল বসুকে। তিনি যে বেঁচে আছেন এটাও সকলের মনে রইল না। মণীন্দ্রলালও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। যাঁদের ভালবাসতেন তাঁদের খবর নিতেন। বই পড়তেন। অসীম আগ্রহ ছিল তাঁর চিরন্তনী সাহিত্যের প্রতি। যা চিরন্তনী বলে তাঁর মনে হত না তাতে তাঁর আগ্রহ ছিল না। যে সামান্য কজন লোক তাঁর কাছে নিয়মিত আসতেন তাঁদের কাছে তাঁর একটাই প্রশ্ন ছিল : ভাল কিছু পড়লে? এই নিমগ্ন সাধকের কোন ক্ষোভ ছিল না। কাউকে কখনো অনুযোগ করেননি। দল পাকাননি। এমন একজন সাহিত্যিককে হারান সত্যি বিরাট ক্ষতি। আমরা তাঁকে আমাদের প্রণাম জানাই।

আত্মপ্রশংসা পাপ। তবু বলি 'বিভাব' মণীন্দ্রলাল বসু বেঁচে থাকতেই তাঁর সম্মানে একটি সংখ্যা বের করছিল। সেই সংখ্যায় প্রকাশিত শর্মিলা বসুর লেখাটি মণীন্দ্রলাল বসু সম্পর্কে এতাবৎ প্রকাশিত সমস্ত আলোচনার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তথ্যের আকর হয়ে আছে; বছর দেড়েক আগে মণীন্দ্রলালকে শরৎ পুরস্কার প্রদানকালে পুরস্কার কমিটি কর্তৃক যা শ্রদ্ধায় স্বীকৃত হয়েছিল।

বিভাব

বিশেষ অনুবাদ-ক্রোড়পত্র

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "ঘরের ছেলে বাইরে" CAST AND OUTCASTএর নির্বাচিত অংশের অনুবাদ

teen.! I beg you to pay
a visit to Akhandananda ji.
Shri Rama Krishna is in
that body. Of course Sargachi
is malarious from July on.
If you cannot go, write a line
for his blessings for your
family. You missed Shri
Mahapurushji. Try not to miss
this great one. Only don't get
Malaria.

Yours
Shan Gopal

ঘরের ছেলে বাইরে

আমেরিকায় পৌঁচেছি! যে মুহূর্তে বন্দর-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এদেশে পা ফেলবার অনুমতি পেলুম তখনি জাপানী জাহাজে সতেরো দিন ডেকবাসের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা যেন নিজের বলে মনেই হ'ল না। কি জানি কেন এ দেশের উপর আমার মনে যে ভক্তি শ্রদ্ধা জেগে উঠ্‌ল তাতে নতজানু হয়ে এ দেশের মাটিকে প্রণাম করবার ভারি ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু আমেরিকানরা এক অদ্ভুত জাত! যে মুহূর্তে তাদের দেশের উপর আমার প্রকৃত মনোভাবের কথা জানলে অমনি আমার মন থেকে যেন-তেন-প্রকারে সে ভাবের মূলোৎপাটনে তারা প্রয়াসী হ'ল।

জাহাজ থেকে নামবার মুখে প্রথম যে লোকটির সঙ্গে দেখা হ'ল তার অদ্ভুত সাজ-সজ্জা দেখে ত আমি অবাক (পরে জানলুম সে overalls পরেছে)। সে আমার জিনিসপত্রের খবরদারী করতে এসেছিল, আমি তাকে আমার তোরঙ্গটা দেখিয়ে দিলুম। বিনাবাক্যব্যয়ে সে ডেক থেকে প্রায় আট-দশ ফুট নীচে জেটির উপর সেটি ছুঁড়ে দিলে। চল্‌তি ভাষায় দখল কিছু কম থাকায় আমার মনোভাবের আভাস দেবার জন্য আমি কবি মিল্‌টনের জলদগম্ভীর পংক্তি উদ্ধৃত করলুম—"Him the Almighty Power hurled headlong flaming from the ethereal sky!" সে লোকটা একটু ব্যঙ্গের সুরে বল্লে—আরে থাম, থাম, এ যে একেবারে নয়া আমদানি দেখছি! মার্কিনের দীক্ষা এমনি করেই সুরু হ'ল।

সে রাতটা একটা বোর্ডিং-হাউসে কাটিয়ে আমি ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার জন্য বার্ক্‌লে শহরে যাত্রা করলুম। কারণ, জ্ঞান আহরণই ছিল

আমার আমেরিকা আসার প্রধান উদ্দেশ্য। একটি বন্ধু আমায় পনেরো ডলার ধার দিয়েছিলেন এবং তাই ছিল আমার একমাত্র সম্বল। জ্ঞানপিপাসু হয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছলুম, কিন্তু আমার জানা ছিল না যে, রুটির মত জ্ঞানেরও দাম দিতে হয়। চুম্বক যেমন ছুঁচ টানে তারা তেমনি ডাক্তারখানার খরচ, ব্যায়ামশালার চাঁদা ইত্যাদি নানারকম ছুতোয় যখন একে একে সব কটা ডলার নিয়ে আমার পকেট খালি করে দিলে আমি তখন ভারি ভয় পেলুম। বিদেশে নিঃসম্বল অবস্থায় চলবে কি করে? যাই হোক, এক সহযাত্রীর সহৃদয়তায় এই বিদেশে আমার বন্ধুর অভাব হ'ল না। জাহাজে বারুশ বলে একজন মার্কিন ইহুদীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে একদিন সেকেণ্ড ক্লাশ ডেক থেকে জাহাজের পিছন দিকে থার্ড ক্লাশে এসে আমার সঙ্গে কথা সুরু করলে। কথাপ্রসঙ্গে মার্কিন সাহিত্যিক ইমার্সনের একটা উক্তি উদ্ধৃত করায় সে চমৎকৃত হয়ে আমায় বল্লে—বাঃ, তুমি ত বেশ শিক্ষিত দেখছি! প্রথম যৌবনের আত্মপ্রত্যয়ে আমি উত্তর করলুম, হাঁ, শিক্ষিত বই কি। এই কথায় আমার উপর তার কেমন মমতা জন্মে গেল, উপরে তার ঘরে আমায় সে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে। বাইরে স্বীকার না করলেও তার সঙ্গে রোজ রোজ চা খাওয়া আমার কাছে একটা গর্বের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া এ-সূত্রে আমি কিছু খেতেও পেতুম। কারণ থার্ড ক্লাশে আমাদের জন্য যে জাপানী খাবারের বন্দোবস্ত ছিল তা আমার গলা দিয়ে নামত না।

বারুশ থাকত সিয়াটলে। আমি বার্কলে যাব শুনে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে এক পরিচয়-পত্র দিয়ে দিলে। তাঁরা থাকতেন ওক্ল্যাণ্ড শহরে। তাঁরা খুব যত্ন করে আমায় সাতদিন রেখেছিলেন। আসবার সময় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি কয়েকটা দিশী কম্বল ও জাপানী ফুলদানী তাঁদের উপহার দিয়ে এলুম। এগুলি আমার তোরঙ্গতেই ছিল। অন্য উপহার কেনবার আমার পয়সা ছিল না এবং যদি সে কথা তাঁরা ঘুণাক্ষরেও জানতেন, তবে আমার কাছ থেকে এক কাণাকড়িও তাঁরা নিতেন না। তাঁদের মত সহৃদয় ও উদার লোক জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি।

কিন্তু এমনি করে দেশী শিল্পের বদলে বিদেশী খাবার সংগ্রহ আর কত দিন চলে! কাজেই তাড়াতাড়ি একজন ভারতীয় ছাত্রের কাছে পরামর্শ চাইলাম। সে বল্লে—বেরিয়ে পড়, একটা কাজ খুঁজে নাও। মনে হ'ল সে ভদ্রলোক ওদেশে বহুদিন যাবৎ আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি কাজ নেবো? সে বল্লে—বাসন-মাজা, ঘর-পরিষ্কার করা, যা পাও তাই! যাও, প্রতি দরজায় ঘণ্টা বাজাও,

কোথাও না কোথাও মিলে যাবে! আমি তার কথামত দরজায় দরজায় ঘণ্টা দুলিয়ে বেড়াতে লাগলাম। প্রতি দরজাই একটু ফাঁক হ'ল, আর শব্দ এল—'ধন্যবাদ, চাই না'—এবং সে স্বর-বৈচিত্র্য কোথাও শার্দ্দূল-গর্জ্জন, কোথাও বা সুন্দরীর হাসিমুখের মিষ্টি কথায় প্রকাশ পেল।

শেষে একটি বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করলে—কি কাজ জানো তুমি? মুখস্থ-মত আমি বল্লুম—সবই পারি—ঘর-পরিষ্কার, বাসন-ধোওয়া—যা বলেন! বাড়ীর কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন—কাল থেকে কাজ আরম্ভ করবে ত! আমি সম্মতি জানালুম—কিন্তু আজ রাতটা কাটাই কোথায়? খুব বিনীতভাবে বল্লুম—আজ থেকে কি আসবো? তিনি একটু গম্ভীরভাবে বল্লেন—বেশ, খিড়কির দিকে তোমার ঘর তৈরী থাকবে।

সেদিন বিকালে আমি সেই বাড়ীতে হাজির হলুম, সঙ্গে আমার বুঁচকি-বোঁচকা ও একখানি বই। বইখানি ইমার্সনের Self Reliance। খিড়কির দিকে একখানি ছোট ঘর দেখিয়ে দিয়ে তাঁরা আমায় কিছু খেতে দিলেন, আমি বর্তে গেলুম, কারণ সারাদিন কিছু খেতে পাইনি।

পরদিন থেকে আমার কাজ আরম্ভ হ'ল। কোনরকমে বাড়ীর ঝাড়-পোঁছ করলুম! ধুলোময়লা জঞ্জালের টবে না ফেলে আমি বাড়ীর পাশের পথটাতে জমিয়ে রেখে দিলুম! পাশের বাড়ীর লোকেরা টেলিফোনে আমার কর্ত্রীকে জানালেন যে দেশের আইনমত পাশের পথ পরিষ্কার রাখা দরকার। নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমি তাড়াতাড়ি শুধু সার্টপরা অবস্থায় (হাতে আবার সাস্‌পেণ্ডার লাগানো ছিল) ঝাঁট দিতে যাচ্ছি দেখে কর্ত্রী বল্লেন—অমন করে গিয়ে আর আমাদের অপ্রস্তুত কোরো না, জ্যাকেট পরে নাও! কোটকে যে এরা জ্যাকেট বলেন তা জানতুম না, তাই তাঁরা যতক্ষণে আমায় ব্যাপারটা সব বোঝাতে লাগলেন, ততক্ষণে হাওয়ায় বেশীর ভাগ ময়লা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

যাই হোক, এ কাজ আমার বেশীক্ষণ টিকলো না। দুপুরের মধ্যে বিস্তর ময়লা বাসন জমা হয়ে গেল। কর্ত্রী বল্লেন—খেয়ে উঠে বাসন ধুয়ে দেবে ত? আমি সম্মতি জানিয়ে তাড়াতাড়ি খেতে বসলুম। বাসনের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। বাইরে চমৎকার রোদ উঠেছিল, বেড়াবার লোভ সামলাতে না পেরে কোটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। যখন ফিরলুম তখন কর্ত্রী খুব রেগে বল্লন—বাসনগুলো ধোওনি যে?

আমি বল্লুম—আপনারা কেমন করে মাজেন ?

তিনি অবাক হয়ে বল্লেন—তুমি তা জান না নাকি ?

আমি বল্লুম - না।

তিনি বল্লেন—বাঃ, তুমি বাসন মাজবে বলেই ত কাজ নিয়েছ।

আমি বল্লুম—মাজবো না কেন ? দেখিয়ে দিলেই মেজে দেবো।

খুব বিরক্ত হয়ে তিনি বল্লেন—তুমি বাপু অন্য জায়গা দেখ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কোন্ জায়গা ?

তিনি বল্লেন—আরে তোমার হয়ে গেল।

আবার আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়ে গেল ?

তিনি বুঝিয়ে বল্লেন যে, আমায় নিয়ে তাঁদের কাজ চলবে না! শেষে একটু হেসে বল্লেন—তা আজ রাতটা এখানে থাকতে পারো।

রান্নাঘরে বসে বসে তাঁর বাসন-ধোওয়া দেখতে লাগলুম—কেমন করে এসব বাসন মাজতে হয়, মুছতে হয়, সব বসে বসে বিশেষ করে লক্ষ্য করতে লাগলুম, যাতে অপর বাড়ীতে এ-জ্ঞান কাজে লাগাতে পারি।

কাজে জবাব পেয়ে আমাদের খুব বিরক্ত লাগলো। মনে করলুম এ রকম খামকা অপমানিত হয়ে আর এদের আতিথ্য নেব না। তাই বুঁচকি-বোঁচকা নিয়ে আবার কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। আবার বাড়ীতে বাড়ীতে দরজায় ঘণ্টা বাজানো সুরু হ'ল—খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে নানারকমের তর্জ্জন-গর্জ্জন কানে আসতে লাগল। একটা বাড়ীতে ঘণ্টা বাজাবার পর চাকরটি এসে দরজা খুলে দিলে ; আমি আশান্বিত হয়ে আমার প্রয়োজন জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিলে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি ভাবলুম, ইংরেজী উপন্যাসে যে লেখে "নাকের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া" এ সেই ব্যবস্থা। আমার আজও মনে আছে যে দরজাটা একেবারে আমার আমার নাকের ডগায় ঠেকেছিল।

যাই হোক, কিছু পরেই আর এক জায়গায় কাজ মিল্‌ল। এবারের কাজ হ'ল বাসন ধোওয়া, কাঁটা-ছুরি পরিষ্কার করা ও খাবার সময় টেবিলে পরিবেশন করা। এর বদলে তারা আমায় থাকতে ও খেতে দিলে। এই সময় কলেজ খুলে গেল, পড়াও আরম্ভ হ'ল, সুতরাং কাজের ফাঁকে ক্লাসে যাওয়া ও পড়াশুনা চলতে লাগল।

এই নতুন বাড়ীতে সকালের বাসনগুলো খুব ভালো করেই ধুয়েছিলুম, সকালে পরিবেশনও করতে হ'ল না। এটা ছিল ছেলেদের ক্লাব। তারা লোক ভালই,

তবে সারাদিন হল্লা করত বিস্তর। কলেজে যাবার জন্য প্রস্তুত হবার আগে মানুষ যে এত গোলমাল করতে পারে কোন কালেই আমার সে ধারণা ছিল না। কী সে হট্টগোল!

সেদিন দুপুরের খাবার সময় টেবিলে পরিবেশনে আমার দীক্ষা হ'ল। প্রথমবার বলে আমি ভারি ভয় পেয়েছিলুম। একটি ছেলে এক প্লেট সুপ চাইলে। তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসে সুপের থালাটা যেমনি ছেলেটির সামনে রাখতে যাবো অমনি তার মাথায় লেগে সমস্ত সুপটা তার পিঠের ভিতর গড়িয়ে পড়লো। যাকে বলে মার্কিন ভাষা এই ব্যাপারে তার যথেষ্ট পরিচয় পেলুম। ক্লাবের চীনা পাচকটি যখন বুঝলে যে পরিবেশনের অ-আ, ক-খ'র জ্ঞান আমার নেই, বিনা বাক্যব্যয়ে সে তখন পরিবেশনের পোশাক—সাদা কোটটি পরে কাজে লাগলো। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি তার কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করতে লাগলুম এবং প্লেটের পর প্লেট সুপ সে ছেলেদের সামনে বসিয়ে দিচ্ছে, অথচ তার হাত একটুও কাঁপছে না দেখে আমার ভারি আশ্চর্য্য মনে হ'ল। পাচক ভদ্রলোকটি আমার উপর ভারি সদয় ছিল ; তার কাছে পরিবেশন ও বাসন মাজার অনেক কায়দা-কানুন শেখবার সুযোগ পেলুম।

কিন্তু আমার এ কাজটিও গেল—এবারের কারণটি আমার অনভিজ্ঞতা নয়, একেবারে বিভিন্ন রকমের। আমি দেখলুম যে চীনেম্যান আমার ঘাড়ে রোজ রোজ নতুন নতুন কাজ চাপাতে লাগলো। পরিবেশন ও বাসন মাজা ছাড়া জিনিসপত্র ঘসা-মাজার কাজও আমায় করতে হ'ল। কাজ বাড়ছে দেখে আমার মনে হ'ল যে কোন্‌দিন বা আমায় আবার রাঁধতে বলে, তাই বিরক্ত হয়ে নিজেই কাজ ছেড়ে দিলুম। কেমন করে যে লোককে অন্যায়ভাবে খাটিয়ে নেওয়া যায় এই ব্যাপারে তার আভাস পেলুম।

আবার কাজ খুঁজতে বেরলুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে শেষে একটা চমৎকার কাজ পেলুম। কাজ হ'ল বাসন ধোওয়া, পরিবেশন ও বিছানা করা, আর তার বদলে পাবো খাওয়া-থাকা বাদে মাসে দশ ডলার। প্রথম দুদিন আমায় বিছানা করতে হ'ল না। কারণ আমার আগে যে ছেলেটি কাজ করছিল, সে ঐ দুদিন থেকে সব ঘরের কাজ করে গেল—আমি আর সে-সব ঘরের ধারেও গেলুম না।

তৃতীয় দিনে সে চলে গেল। ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে সকাল বেলার বাসন ধুয়ে আমিও কলেজে গেলুম। দুপুরে এসে পরিবেশন করে আর ডিস ধুয়ে আবার

কলেজে বেরিয়ে পড়লুম। বিকালে ফিরে এসে বিছানা করতে গিয়ে দেখি একটা চীনা ছোকরা কাজ করছে। আমি বল্লুম—তুমি এখানে করছ কি? সে বল্লে—বিছানা করছি। আমি বল্লুম—তুমি করছ কেন—ও ত আমার কাজ! সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে আমায় জানিয়ে দিলে যে এ-বাড়ী থেকে আমার অন্ন উঠেছে।

পরে জানলুম যে বিছানাগুলো আমার সকালেই করা উচিত ছিল, বিকালের জন্য ফেলে রাখা ঠিক হয়নি—তাই এসে দেখি আমার জায়গায় চীনা ছোকরার অধিষ্ঠান হয়েছে। যাই হোক দাঁড়িয়ে থেকে তার বিছানা করা শিখে তবে সে বাড়ী ছাড়লুম।

দু'দিন কাজ করেছি বলে বোধ হয় কয়েক সেণ্ট মজুরী পেয়েছিলুম। পকেটে সেই সম্বল আর বগলে পুঁটুলি নিয়ে সারাটা দিন কাজ খুঁজে কাটিয়ে দিলুম। রাত হ'ল - কোথাও আশ্রয় পেলুম না। মাথা গোঁজবার স্থান না পেয়ে জীবনে এই প্রথম সারারাত আমায় রাস্তায় রাস্তায় পায়চারি করে কাটাতে হ'ল।

সকালে আর আমার ধৈর্য্য রইল না—হাতে যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে বেশ পেট ভরে খেলুম। মনে করলুম বাকি পয়সায় যতক্ষণ চলে চলুক, মরে যাই তাও স্বীকার, তবু কারো দোরে যাবো না। পথ চলছি এমন সময় এক বোর্ডিং-হাউসের বাড়ীওয়ালী আমায় ডেকে বল্লে—তুমি ডিস ধুতে পারো? খুব জোরের সঙ্গে বল্লুম—হ্যাঁ, পারি বৈকি! সে বল্লে—পরিবেশন করতে জানো? আমি বল্লুম—জানি। বিছানা করতে পারো? আমি বল্লুম—হ্যাঁ, সে বিদ্যাও আমার জানা আছে।

বাড়ীওয়ালী বল্লে—বেশ, তাহলে আজ দুপুর থেকে কাজে লাগো—আমার লোকটি চলে গেছে। এ বাড়ীতে সব কাজই আমি বেশ গুছিয়ে করতে লাগলুম, কাজেই ভয়ের কিছুই রইল না।

এদিকে কিন্তু কলেজের পড়াশুনায় আমি ভারি হতাশ হয়ে গেলুম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রবেশিকা পড়ি তখন থেকেই শিক্ষকদের সততা সম্বন্ধে ভারি একটা সন্দেহ ছিল। আমরা সব সময়ে ভাবতুম যে সরকারের বেতনভোগী বলে তাঁরা সত্য কথার বদলে সরকারের মনযোগানো কথা বলতেন। আমার বিশ্বাস সে সময়ে ফরাসী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কয়েকখানা বই পড়ানো সরকার থেকে বন্ধ করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে Burke লিখিত Reflections on the French Revolution পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল কিন্তু ও-ধরণের শান্ত-শিষ্ট

বই পড়ে কেউ সন্তুষ্ট হতে পারত না। মানুষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে আমরা তখন বন্ধুমহলে ভয়ানক আলোচনা সুরু করেছিলুম আমরা অনেকেই বুঝেছিলুম যে এসব সম্বন্ধে অনেক সত্য কথাই আমাদের শেখানো হয় না, কারণ তা নাকি ভয়ানক বিদ্রোহদ্যোতক সুতরাং ফরাসী বিদ্রোহ বা ইংলণ্ডে ক্রমওয়েল-যুগের অন্তর্বিদ্রোহের ইতিহাসের কোনো ভয়ানক জায়গা এলেই আমরা নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া সে সম্বন্ধে যত বই পেতুম তা পড়ে নিতুম। শিক্ষকের কথার প্রতিবাদ করে সত্যটুকু জানাই ছিল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানবৃদ্ধির এ-রকম কোন সদাজাগ্রত চেষ্টার লক্ষণ দেখলুম না। কলেজের ছেলেরা কেবলই দেখছি নোট টুকছে; অধ্যাপকের উক্তি তাদের কাছে বেদের মতই যেন অভ্রান্ত। অধীত বিষয় জানবার জন্য না ছিল কোন প্রশ্ন না ছিল কোনো আলোচনা! পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে অধ্যাপকের জ্ঞান প্রয়োজনের চেয়ে কম জেনেও যখন ছেলেদের প্রতিবাদ করবার কথা মনে হ'ত না তখন আমার ভারি অদ্ভুত লাগত। অবশ্য ভারতে প্রতিবাদ করে ফল কিছুই হ'ত না কিন্তু এ সময়ে মার্কিন ছাত্র-সমাজ যেন একেবারে উদাসীন ছিল। তারা কলেজে এসেছে পরীক্ষা পাস করতে আর অর্থকরী বিদ্যা শিখতে এবং সেটুকু ভাল করে হলেই তারা খুশী হ'ত। অধ্যাপকের কথা সত্য কি মিথ্যা তাতে তাদের কি আসে যায়!

একদিন টেবিলে পরিবেশন করবার সময় একটি ছেলে আমার দিকে চেয়ে বল্ল—তোমায় ক্লাশে রোজ দেখি না? আমার ঘরে এসো না, বেশ কথা হবে! তার সঙ্গে আমার দেশ-প্রচলিত প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধর কথাটাই প্রথম মনে এল। আমি তাকে সেলাম করে পূর্ব্বের মত পরিবেশনে মন দিলুম এবং এমনভাবে ব্যবহার করতে লাগলুম যেন তার কথার একবর্ণও আমি বুঝিনি। তাই যখন খাওয়া শেষ হ'ল সে ছেলেটি রান্নাঘরে এসে আমায় খেতে দেখে বল্লে—বুঝলে, খাওয়া সেরে আমার ঘরে একবার আসছ ত?

আমি বল্লুম—কোন্ ঘরে?

সে বল্লে—আমার ঘর ত তুমি জানো।

আমি বল্লুম—বেশ যাবো।

সন্ধ্যাবেলা সেদিন যখন তার ঘরে হাজির হলুম সে খুব খুশী হয়ে বন্ধুর মত যত্নে আমায় বসালে।

কথাপ্রসঙ্গে সে আমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—তুমি এনার্কিজম সম্বন্ধে কিছু জানো?

আমি বল্লুম—জানি এবং ক্রপটকিনের কমিউনিজমে বিশ্বাস করি।

সে তাচ্ছিল্যভরে বল্লে—আরে ছোঃ, সে আদৌ এনার্কিজম নয়—সেটা ছ্যাচড়া।

সে আবার কি?

যা রোজ খাও—রাবিশ আর কি!

তার কথা শুনে আমি ত হতভম্ব! ক্রপটকিনের Conquest of Bread গ্রন্থে ত এ ছ্যাচড়ার কোন উল্লেখ দেখি নি। লিও (Leo) (ছেলেটির নাম) আবার ভাল ছ্যাচড়া ও মন্দ ছ্যাচড়ার তফাৎ বোঝাতে লাগলো। ক্রপটকিনই বা কি দিয়েছেন, টলষ্টয়ই বা কি রচেছেন, সব কথা বলে Proudhon প্রচারিত এনার্কিজম-এর স্বপক্ষে একটা সতেজ বক্তৃতা দিয়ে সে থামল। তার বিশ্বাস যে কমিউনিজমরূপ রাবিশ সাফ করবার এই একমাত্র সম্মার্জ্জনী। অবশ্য তাঁদের সবাইয়ের রচনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও উপরিউক্ত ভদ্রলোকদের নামগুলি আমার শোনা ছিল।

লিও আমায় তার ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলি লক্ষ্য করতে বল্লে। ঘরে প্রথম ছবি ছিল Adam Smith, দ্বিতীয় Tolstoi, তৃতীয় Bakunin, চতুর্থ Kropotkin, পঞ্চম Karl Marks, ষষ্ঠ Victor Hugo এবং সপ্তম ও শেষ ছবি ছিল Jesus Christ-এর একে একে সবায়ের কথা কিছু কিছু বলে যীশুর ছবি দেখিয়ে সে বল্লে—এ লোকটির সঙ্গে কোন চার্চ্চের সংস্রব ছিল না এ কথা তোমার ভাল করেই জানা উচিত।

আমি বল্লুম—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

আমার কথা শুনে সে খুব উত্তেজিত হয়ে বল্লে—তোমারও মনে হয়—আরে তুমি যদি তাঁকে হাতে ধরে চার্চ্চের সামনে নিয়ে গিয়ে বলতে, প্রভু, এটা আপনার বাড়ী, তা হলেও তিনি তা স্বীকার করতেন না—নিজের বলে' চিনতেন না।

আমি বল্লুম—আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না যে ইনি প্রথম শ্রেণীর লোক?

সে বিশ্বাসী ভক্তের মত মৃদু হেসে বল্লে—যিনি শেষ তিনিই প্রথম!

আমি তাকে তার নিজের জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করলুম। বর্তমান সমাজের ভিত্তি যা নাড়া দেয় এমন সব সমস্যা, এত সব কথা, সে কেমন করে জানলে?

সে বলতে লাগল—'আমি এক আইরিশ পরিবারে জন্মেছি। আমার বাবা মা আয়ারল্যাণ্ডে এক রেল দুর্ঘটনায় মারা পড়েন। আমার এক অবিবাহিতা পিসি আমাদের তিন ভাইকে নিয়ে এখানে এক কাকার বাড়ীতে উঠলেন। ক্যালি-

ফোরনিয়ায় ওকালতি করে তিনি বিস্তর পয়সা করেছেন। তিনিই আমাদের মানুষ করলেন। আমার দাদা ব্যবসা শিখতে গেলেন, আমি ক্যাথলিক পাদ্রী হব হলে' প্রস্তুত হতে লাগলুম এবং আমার ছোট ভাইটি আইন পড়তে গেল।

বড় হয়ে পাদ্রী হব বলে' ছেলেবেলা থেকেই আমি জেসুইটদের স্কুলে ভর্তি হলুম। সেখানে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ ও কিছু কিছু গ্রীক শিখলুম। সেখানে প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকদের জীবনী ও খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস আমাদের পড়তে হ'ল। ক্রমে ক্রমে দেখি তারা আমার মনের সামনে এক বিরাট্ প্রতিষ্ঠান খাড়া করে তুল্লে—একদিকে তার ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া-কলাপ আর অপরদিকে কূট-চিন্তার পদ্ধতি। এ দুটি জিনিস পোপের অভ্রান্ততা—এই মতবাদ দিয়ে এক সঙ্গে গাঁথা। এইখানে জেসুইট পাদ্রীরা যখন আমায় পড়াতেন তখন আমার মনে হ'ত যে লোক যদি সত্যই ধার্ম্মিক হয় তবে এঁদের মত দারিদ্র্য বরণ করেও উপলব্ধ সত্য প্রচারে জীবন উৎসর্গ করা উচিত।

নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ও অধ্যাপকের মতের অনুকূল কয়েকটি বই ছাড়া বাইরের বই আমাদের পড়তে দেওয়া হ'ত না। কিন্তু একজন অধ্যাপক আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে তাঁর লাইব্রেরী দেখাতে দেখাতে প্রসঙ্গক্রমে কতগুলি বই দেখিয়ে বল্লেন সে সেগুলি অজ্ঞেয়বাদীদের রচনাবলী। বিশেষ করে একখানি বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে—সেখানি Buckle প্রণীত Introduction to the History of Civilisation in England। কোন কাজে যখন অধ্যাপক ঘর ছেড়ে চলে গেলেন আমি সেখানে বসে বইখানির পাতা উল্টাতে লাগলুম। কয়েক পাতা পড়তেই এমন আগ্রহ জন্মে গেল যে ছাড়তে পারলুম না, বইখানি নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সারারাত ধরে পড়লুম।

পরের দিন রাতে আবার বাক্‌ল্ নিয়ে বসলুম। এক জায়গায় এই কয়টি পংক্তি দেখতে পেলুম—'যদি পৃথিবীর তাপ বদলায় ও বাতাসে সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন কমে যায়, তবে পৃথিবী এমন সব প্রাণীর আবাসভূমি হবে যার সঙ্গে মানুষের কোন মিল নেই এবং সর্ব্ববিষয়ে তাদের ধারণা মানুষের থেকে একেবারে বিভিন্ন হয়ে যাবে।' বই বন্ধ করে আমি ভাবতে লাগলুম। এতদিন আমায় বিশ্বাস করতে হয়েছে যে ঈশ্বরের মত সত্য, অসীম ও সম্পূর্ণ—ভাল বা মন্দ কোন কিছুই আপেক্ষিক নয়। কিন্তু ধর যদি বাক্‌ল্-এর কথাই সত্য হয় তাহলে এই পরিবর্ত্তিত বিশ্বে যারা থাকবে তারা বর্ত্তমানের লোকেদের থেকে একেবারে ভিন্ন হয়ে যাবে! ভাল, মন্দ, ভগবান এই সবের এত দিনের ধারণা একেবারে

লোপ পেয়ে যাবে! পোপের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে ধারণাও তাহলে বদলাবে। মনে আমার কেবলই এই কথা জাগল যে তাহলে কোন কিছুই সম্পূর্ণ নয়! সবই আপেক্ষিক!

ঘরে বইখানা ফেলে রেখে আমি বেরিয়ে পড়লুম। আমার দৃঢ় ধারণা হ'ল যে সব জিনিসই যখন আপেক্ষিক তখন ভগবানকে সম্পূর্ণ বলে কেমন করে স্বীকার করব? ভাবতে ভাবতে বাগানের বেড়া ডিঙ্গিয়ে আমি রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলুম।

খুব বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তারপর তুমি কি করলে? তারাই বা কি করলে?

লিও বল্লে—তারা আমার আত্মীয়দের খবর দিলে! এতদিন ধরে তারা আমায় যে সোশিয়ালিস্টদের ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল আমি সোজা তাদের আস্তানায় গিয়ে উঠলুম! আমি যে কোথা থেকে আসছি সে কথা আর তাদের কাছে ভাঙ্‌লুম না। তারা আমায় ডারউইন আর স্পেন্সারের বই পড়তে দিলে। ডারউইনের মতবাদে আমার মাথা একেবার ভরে গেল—আমি তাঁর ভারি পক্ষপাতী হয়ে উঠলুম। তাঁর বইয়ের পাতার পর পাতা শেষ হতে লাগল এবং আমার এতদিনের নানা বিশ্বাস ও অবিশ্বাস একেবারে শুধু যে চূর্ণ হয়ে গেল তা নয়, মনে হ'ল যেন সেসব ধারণা আমার কোনদিনই ছিল না। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, যে-মতবাদের জোরে আমার সব নষ্ট হ'ল তারও কোন ভিত্তি নেই।

ক্রমে আমি স্যোশিয়ালিষ্টদের দলে ঢুকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে কাঠের উপর উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে সুরু করলুম। কিন্তু যতই তাদের সঙ্গে মেলামেশা হতে লাগলো ততই বুঝলুম বেশীর ভাগ লোকের মনেই উৎকর্ষের কোনো ছাপ নেই। আমি যে জেসুইট পাদ্রীদের কাছে শিখেছিলুম—তাদের মত জ্ঞানের সম্পূর্ণতার বা ধারাবাহিকতারও এদের খুবই অভাব ছিল। আমার আর তাদের ভাল লাগল না। কারণ আমার এতদিনের শেখা চর্চ্চা-পদ্ধতির বদলে তারা এক সমাজ-পদ্ধতির নক্সা আঁকলে যা অতি জঘন্য বলে মনে হ'ল। যেসব পবিত্রতা ও ধর্ম্মবিচারের মধ্যে আমি মানুষ হয়েছিলুম এ প্রণালীর মধ্যে তার নামগন্ধও ছিল না। তাই সমস্ত সোশিয়ালিষ্ট-পদ্ধতি ছুঁড়ে ফেলে আমি স্বাতন্ত্র্যমূলক এনার্কিজম বা নৈরাজ্যবাদ বরণ করে নিলুম।

এই সময় আমি টলষ্টয়, ক্রপটকিন ও অন্যান্য বহুলোকের বই পড়লুম।

আমার মানসিক প্রকৃতির সঙ্গে তাদের বেশ মিল হ'ল। পদ্ধতিহীনতার বদলে এঁদের কাছে এবার পেলুম পদ্ধতি, প্রভুত্বের বদলে এঁরা দিলেন স্বাধীনতা এবং সামাজিক যূথ-বদ্ধতার বদলে এঁরা শেখালেন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্র।

এদিকে কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজন আমার খোঁজ পেলেন এবং কোথায় আছি আর কি করছি জেনে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ তাঁরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত মূলধনী মহাজন শ্রেণীর লোক। তাঁরা আমায় এই ব্যর্থ ভবঘুরে জীবনের মোহ কাটিয়ে শান্ত ছেলের মত কলেজে ফিরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। যদি কলেজে গিয়ে আইন পড়ি তাহলে একটা মাসিক বৃত্তি দিতেও স্বীকৃত হলেন। তাই আজ আমি এখানে এসেছি এবং যে-অন্ধকারে পণ্ডিতেরা অন্ধভাবে ঘুরছেন, তার মধ্যে থেকে আলোক আহরণের চেষ্টা করছি।

তার কথাগুলো আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করলে। অন্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে যেখানে বিচরণ করছি সেখানকার অন্ধকার যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। সে আমাকে দেশের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলে, আমার মনের দ্বন্দ্বের খবর নিলে, কিন্তু বেশ বুঝলুম এতে তার কোন আগ্রহ ছিল না। সে যা বাস্তবিক জানতে চাইছিল তা হচ্ছে যে, আমি স্বাতন্ত্র্যবাদী এনার্কিষ্ট হবো কিনা। এই চেষ্টার মধ্যে তার জেসুইট শিক্ষার প্রভাব প্রকাশ পেল। সে যেন সর্ব্বক্ষণ লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে যাকে তার দলে টানতে পারে।

আর এক সপ্তাহের মধ্যে লিওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব জমে উঠ্‌ল। সে বোর্ডিং-হাউস ছেড়ে দেবে ঠিক করে তার বৃত্তির টাকায় একটা ছোট ঘর নিয়ে আমায় তার সঙ্গে থাকবার কথা তুললে। ঠিক হ'ল যে দিনে তিনবারের বদলে আমরা দু'বার খাবো এবং কোন সস্তা হোটেলে একটা ছোট ঘরে দু'জনে থাকব। আমার দিক থেকে আপত্তি করবার কিছুই ছিল না, কাজেই এ প্রস্তাবে খুব খুশী হলুম। শুধু যে বাসন মাজার নোংরামি আর দাস্যবৃত্তির হীনতা থেকে মুক্তি পাবো তা নয়, এমন লোকের সঙ্গও পাবো যার কথা ও কল্পনা আমায় মুগ্ধ করেছে।

এমনি করে আমাদের নতুন ঘরকরনা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব বেশী পড়াশুনাও আরম্ভ হ'ল। দিনে আমরা প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টার উপর পড়তুম। প্রসিদ্ধ হলেও এতদিন যেসব লেখকের রচনা আমরা পড়িনি, সেই সব নিয়ে বসলুম। ওয়্যাল্ট হুইটম্যানের অন্তরের কথা কিছু বুঝলুম, বার্নার্ড শ'র সঙ্গে একটা চলতি আলাপ জমিয়ে নিলুম, প্লেটোর দরজায় ঘা দিলুম, কিন্তু তাকে

পুরানো দলের বলেই মনে হ'ল। তারপর আমরা পড়লুম Proudhon-এর—'সম্পত্তি কি?'—What is Property? সম্পত্তি যে ডাকাতি (লুটের মাল) তাঁর কাছে এ উত্তর পেয়ে খুব খুশীও হলুম। Thoreauকেও আমরা আবিষ্কার করেছিলুম! তারপর শেষকালে এল নিট্‌শের বজ্রবিদারণ মন্ত্র—"বহুদিন পূর্ব্বে ভগবান গতাসু হয়েছেন—তাঁর Thus Spoke Zarathustra পুস্তকে নায়কের মুখে এই উক্তি শুনে আমাদের বিশ্বাস হ'ল যে এইবার আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে।

কিন্তু অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসের মত কলেজের পরীক্ষা অলক্ষিতে ঘনিয়ে এল। লিও একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, আমি কোনরকমে এ যাত্রা বেঁচে গেলুম। পর বছর আমি একা পড়লুম, কারণ লিওর আত্মীয়েরা এই অনর্থকরী বিদ্যাসঞ্চয়ে বাজে খরচ করবার জন্য তাকে বৃত্তি দিতে রাজী হলেন না। এতে লিও খুব রেগে গেল ও আমায় বল্লে—"দেখলে ত, পড়াশুনা সম্বন্ধে মহাজনী ধারণাটা কি রকম? পরীক্ষায় যদি পাস হও তবে তোমায় তারা বুদ্ধিমান বল্‌তে রাজী আছে, ভাগ্যে আমি পাস হইনি!" তারপর তার বইয়ের বাণ্ডিল পিঠে ফেলে সে চলে গেল।

আবার কাজের জন্য বিরক্তিকর হয়রানি আরম্ভ হ'ল। দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে হাতে ব্যথা হ'ল, কিন্তু কাজ কোথাও পেলুম না। মাঝে মাঝে হঠাৎ লিও কোথা থেকে এসে হাজির হ'ত, কারণ, সে জানত যে ঘরের ভাড়া শেষ না হওয়ায় আমি তখনও সেই ঘরে আছি। সে প্রায়ই এসে দেখত যে বিছানায় বসে আমি অন্তত একটি প্রধান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি এবং সে সমস্যা হচ্ছে 'ক্ষুধা'। যখনই সে আসত, দয়া করে হয় রুটি না-হয় কিছু অর্থ আমায় দান করে যেত। বাধ্য হয়ে আমায় রুটি আর জল খেয়ে দিন কাটাতে হ'ত। আমার বেশ মনে আছে যে আমার অনিচ্ছা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমার কলেজের মাহিনার জন্য লিও আমায় পনেরো ডলার গছিয়ে দিয়েছিল। "এ তোমার নিতেই হবে। কে জানে—তুমি হয়ত একদিন জানতে পারবে মহাজনদের অস্তিত্বের ভিত্তিটা কোন্‌খানে, আর একবার সেই গোপন কথাটা জানতে পারলে তাদের অস্ত্রেই তাদের নিধন করবে!"

কি আশ্চর্য্য, দিনে দুখানা সস্তা রুটি আর জল খেয়ে আমরা মহাজনীতত্ত্ব আলোচনা করতুম আর ভাবতুম যে বছর পাঁচেকের মধ্যেই সে ব্যবস্থার পতন অনিবার্য্য। আমার বয়স তখন প্রায় উনিশ।

অবশেষে মেয়েদের ক্লাবে একটা কাজ পেলুম। সেখানে বাসন-মাজা, ওঘর খেলার মাঠ সাফ করা আর পরিবেশনের বদলে তারা খাওয়া বাদে মাসে দশ ডলার দিতে রাজী হ'ল। তারা মাহিনা দিত সপ্তাহ হিসাবে। প্রতি শনিবার বিকালে সপ্তাহ শেষে যেদিন এই আড়াই ডলার হাতে পেতুম সেদিন মনে হ'ত যেন রাজ-ঐশ্বর্য্য লাভ করেছি।

মনে আছে প্রতি রবিবার বিকালে গাড়ী করে লিওর সঙ্গে দেখা করতে যেতুম! প্রায়ই দেখতুম রাস্তার মোড়ে একটা উল্টানো টবের উপর দাঁড়িয়ে সে বক্তৃতা দিচ্ছে। তার কথা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতুম। সে বক্তৃতা শেষ করে লোকেদের বলত—আমার এই হিন্দু বন্ধু আপনাদের কাছে টুপি নিয়ে যাচ্ছেন! এদেশে পেলা আদায়ের এই হচ্ছে ভদ্র পন্থা। টুপিতে কখনও পঞ্চাশ সেণ্টের বেশী আদায় হ'ত না। তাই আমার মাহিনা থেকে বাকিটা দিয়ে লিওকে আমি এক ডলার দিতুম। বক্তৃতা শেষে লিও আমায় রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে যেত। সে খেত খুব কমই কিন্তু প্রায় মাঝরাত পর্য্যন্ত আমাদের আলোচনার জের চল্‌ত! রাত্রে বিদায় নেবার সময় যখন তাকে আমার সঙ্গে ঘরে আসবার জন্য অনুরোধ করতুম সে আপত্তি জানিয়ে বলত—"না, রাতের পর রাত যতই আমি পথে পথে ঘুরি ততই এই মহাজনী ব্যবস্থার ভীষণতা যেন বেশী করে উপলব্ধি করি।"

জীবনে এবার প্রথম বুঝলুম যে এক স্যুট পোশাকে সারা বছর কাটানো চলে কিন্তু এক জোড়া জুতো ততটা কাজের নয়। ক্যালিফোরনিয়ায় বর্ষা নামবার আগেই আমার জুতো জোড়াটি শতছিদ্র ঝাঁজরির মত হয়েছিল। ক্লাবের রাঁধুনী ছিল একটি বর্ষিয়সী নিগ্রো স্ত্রীলোক। একদিন রান্নাঘরে যাবার সময় আমার জুতোর মধ্যে দিয়ে নানা পথে জল ঝরছে দেখে বল্লে—ব্যাপার কি? তোমার ভাল জুতো নেই নাকি?

আমি বল্লুম—না, শুধু এই জোড়াই আছে।

নতুন এক জোড়া কিনলেই পারো!

কিনব কি করে, পয়সা কোথায়।

সে তখন বল্লে—তাহলে বলতে চাও যে তোমার মত অভাগার এক জোড়া জুতো কেনবার পয়সা নেই।

আমি বল্লুম—অভাগা না হতেও পারি, তবে পয়সা নেই এটা সত্যি। কথাটা তার প্রাণে লাগল। সে বল্লে—দেখদেখি আমার ছেলে লক্ষ্মীছাড়া ক্লারেন্স

বাবুয়ানা করে আমার পয়সা ওড়ায় আর তুমি একজোড়া জুতো পরতে পাও না!

আমি গম্ভীরভাবে বল্লুম—মিসেস রোড্‌স্‌, এ দোষ শুধু মহাজনী ব্যবস্থার, আর কারো নয়!

সে তখনি আমার হাতে পাঁচ ডলার দিয়ে বল্লে—যাও, আগে নতুন জুতো কিনে এনে তবে কাজ করো।

আমি আপত্তি জানালুম—তোমার টাকা আমি নিতে পারবো না।

খুব হেসে সে বল্লে—এ শুধু তোমার ব্যবস্থার দোষ! তারপর আমায় জোর করে ঘরের বাহিরে সরিয়ে দিয়ে শাসালে যে যদি নতুন জুতো পরে না আসি তবে তার রান্নাঘরে আমায় কাজ করতে দেবে না। কাজেই তখনি একজোড়া নতুন জুতো কিনে আনলুম। পরে যখন হাতে টাকা পেয়ে তার ধার শোধ করতে গেলুম নিগ্রো মেয়েটি তা নিতে অস্বীকার করলে।

মেয়েদের ক্লাবে নিত্য কাজের একঘেয়ে রুটিনে যখন মনটা বিরক্ত হয়ে উঠছে এমন সময় একদিন ক্লারেন্সের বাপ সশরীরে এসে হাজির হলেন। জানালার বাহিরে একটি কাফ্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি মিসেস রোড্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলুম—ও লোকটি কে?

সে বল্লে—আরে ওই ত ক্লারেন্সের বাবা! ওকে আমি বহুদিন আগে ডাইভোর্স করেছি। এখন আবার টাকার দরকার, তাই আমার কাছে এসে জুটেছে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি ওকে কত করে দাও?

তা কি আর মনে আছে! তারপর হঠাৎ আমার কাছে সরে এসে হাসতে হাসতে বল্লে—আমার কথা বিশ্বাস কর, একদিন তুমিও বিয়ে করে স্ত্রীকে এমনি করে ফেলে পালাবে।

তারপর ক্লারেন্সের বাবা ভিতরে এলও আমরা একসঙ্গে খেতে বসলুম। ক্লারেন্সও এই সঙ্গে জুটে গেল! মিষ্টার রোড্‌স আমার দেশ কোথায় জিজ্ঞাসা করে যখন জানলে যে আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, তখন বল্লে—তুমি খৃষ্টান হয়েছো কি?

আমি স্বীকার করলুম যে তা হইনি। ভদ্রলোক আমার মত বেচারার জন্য মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হয়ে জানালে যে তাহলে আমার মত অসভ্য পৌত্তলিকের যে কোথাও স্থান হবে না।

তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—মিষ্টার রোড্‌স্‌, আপনি কি খৃষ্টান?

খৃষ্টান কি বল্‌ছ, আমি নিজে একজন পাদ্রী। অন্য লোকে যত লোকের

আত্মার মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করে তার চেয়ে বেশী লোককে আমি স্বর্গে পাঠিয়েছি। যাক্‌, আমার কথা ছেড়ে দাও। আচ্ছা তোমাদের দেশে তোমরা কি পূজো কর—গাছ, পাথর এইসব তো?

আমি বল্লুম—হ্যাঁ, শুধু গাছ-পাথর নয়, আরও কত কি।

সে তখন একটি চমৎকার কথা বল্লে—তা নাহলে আর তোমরা এত তলায় পড়ে আছ? আমাদের মত সভ্য অ্যামেরিকানদের একবার দেখ, জগতে আমরাই সবার চেয়ে ভাল, কারণ আমরা সবাই খৃষ্টান!

কিন্তু যাবার সময় সে ভদ্রলোক মিসেস রোড্‌সের কাছ থেকে দুটি মোহর নিতে যে ভোলেনি সে কথা আজও আমার মনে আছে। মিসেস রোড্‌স আমায় বল্লে—তুমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না, ও মোটেই পাদ্রী নয়। সেই যারা রবিবারের বিকেলে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে মাথা ফাটায় ও সেই দলের, অন্য লোকের চেয়ে তাতে ওরই উপকার হয়।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ওকে তুমি ত্যাগ করেছ কেন?

ও যে কাজ করতে চায় না, তার ওপর আমার মাইনের টাকা নিয়ে বাবু মদ খেয়ে ওড়াবেন। এখন ত আর বেশী মদ খেতে পায় না—তাই রবিবারে চেঁচিয়ে মরে। কিন্তু দেখ তোমায় একটা কথা বলে রাখি, টাকার দরকার হলেই আমার কাছে এসো, জানলে? আমায় ভুলো না! তোমার মত ভাল ছেলে আমি কখনও দেখিনি—তুমি সারাদিন কাজ কর—আচ্ছা, তোমার কি খুব মাথা আছে?

আমি বল্লুম—কি জানি! তার সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়া দেখে মনে হ'ল যে সেও তা জানে না।

দিনের পর দিন কেটে গেল। ক্রমে আমার গরমের ছুটির আগে পরীক্ষার দিন এসে পড়ল। লিও এই সময় খুব ঘন ঘন আসত। আমি তার জন্য কলেজ-লাইব্রেরী থেকে বই সংগ্রহ করে আনতুম। একবার তার জন্য Hegel নিয়ে এলুম। সে ক্রমে Aristotle পড়লে, Schopenhaureও বাদ গেলেন না! হেগেলের দর্শন সম্বন্ধে ধারণা এখন খুব পরিষ্কার হয়ে গেল, ভারী সুন্দর ভাবে সে তা বোঝাতে পারত। আমি জানি তার এই দর্শন-পাঠ সাধনার যুগে সে দিনে মাত্র একবার সামান্য কিছু খেয়ে থাকত। একদিন তাকে সে-কথা বলতে সে উত্তর দিলে—ভরা পেটে কি আর দর্শন পড়া চলে—ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি অনাহারে থাকতে পারি!

গরমের ছুটির সময় আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সানফ্রান্সিসকোতে গেলুম ভাল কাজের সন্ধানে। লিও আমার সঙ্গী হ'ল, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করলে যে জীবনে কাজ আর সে কখনও করবে না। সে বল্লে—মহাজনী ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্যে কেন খাটব বল ত?

আমি যখন বল্লুম—বাঃ! কারুকে না কারুকে কাজ ত করতে হবে।

তার উত্তরে সে শুধু বল্লে—বেশ, তোমার খুশী হয় তুমি করগে যাও।

আমি বল্লুম—আচ্ছা, আমিই যাবো।

একটা সারাদিনের কাজও পেলুম; কাজ হ'ল একটা বোর্ডিং-হাউসে ত্রিশ জন লোকের খবরদারি করা, পরিবেশন, বাসন ধোওয়া, বিছানা করা আর টেলিফোন ধরা। কাজ সারতে প্রায় ঘণ্টা দশেক লাগত, কিন্তু তবু ত সন্ধ্যেটা ছুটি থাকত। এই কাজে খাওয়া-থাকা বাদে মাসে কুড়ি ডলার করে পেতুম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় লিওর কাছে যেতুম আর সে যে বই পড়ছে তার সম্বন্ধে আমায় সব কথা বল্‌ত।

এর বাড়ীতে এক অদ্ভুত ও বিশ্রী রকমের অর্থলোভের নমুনা দেখলুম। বাড়ীওয়ালীর বৃহৎ পরিবারে কু-পোষ্যের সংখ্যা ছিল বিস্তর। তার স্বামী বা তার ছেলেরা কেউই কাজ করত না, একটি ছেলে আবার রোজ মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরত। তার তিনটি মেয়ের মধ্যে একজনের বিয়ে হয়েছিল বটে কিন্তু সেও সপরিবারে সেই বাড়ীতে থাকত। সুতরাং ত্রিশজন ভাড়াটে বাসিন্দার পয়সায় বাড়ীওয়ালী আরও ত্রিশজনকে ভাত-কাপড় দিয়ে পুষছিল। যারা কানাকড়ি দিয়েও তাকে সাহায্য করত না, বেচারী বাড়ীওয়ালী তাদেরও ফেলতে পারেনি—স্বামী, পুত্র নাতিকে আর কোথায় ফেলবে? লোকগুলো সারাদিনই বাড়ীতে থাকত, কিন্তু কুটোটি নেড়ে উপকার করত না, গা ঘামাবার তাদের কি গরজ? টেলিফোনের ঘণ্টা বেজেই চলেছে, সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও একবার ধরবে না। বাপটা ছিল একেবারে পয়লা নম্বরের বদমাস—সারাদিন হল্লা চেঁচামেচি করছেই করছে! এ নরকে বাড়ীওয়ালী যেন দেবীর মত বিরাজ করত। কিন্তু এই কু-পোষ্যের পাল ভরণ-পোষণের জন্য সে কেবলই যে-কোন প্রকারে পয়সা করবার ফিকির খুঁজত।

বাড়ীর মেয়েগুলো ভাড়াটে পুরুষ বাসিন্দাদের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করত যে তা দেখে আমার ভারী বিরক্ত লাগত। পরে বুঝলুম যে এই কারণেই ভাড়াটেরা এ আস্তানা ছাড়তে চাইত না এবং সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে

মেয়েরা নিজে থেকে এমনি করে যার তার সঙ্গে মিশতে চাইত না বা মিশে খুশীও হ'ত না, কিন্তু এই বৃহৎ পরিবার পালনের জন্য বাধ্য হয়ে তাদের এ কাজ করতে হ'ত।

যে-কোন রকমে এরা লোকজনের পয়সা ফাঁকি দেবার চেষ্টা করত। চাকর-বাকর কেউ ছুটি নিলেই মাহিনা থেকে পঞ্চাশ সেণ্ট কাটা যাবে। আমি দেখতুম মাসের শেষে আমার কুড়ি ডলার থেকে প্রায় পাঁচ ডলার কাটা গেছে, কিছু-বা ধোপা-খরচ বলে, কিছু-বা ভাঙ্গা প্লেটের দরুন, আর কিছু বা ছুটির খাতে! টেবিলে পরিবেশনের সময় আমায় তারা যে সাদা জ্যাকেট পরাতো বা অন্য কাজের সময় যে এপ্রন ব্যবহার করতে দিত মাসের মাহিনা থেকে সেজন্যও কিছু কেটে নিত। দিনের পর দিন তাদের এই চুরি ও উঞ্ছবৃত্তি দেখে আমার মনে হ'ত যে মহাজনী ব্যবস্থা যেন উপরে উঠতে উঠতে এই বাড়ীওয়ালীর মাথায় চড়ে তার চরম সীমায় পৌঁচেছে। যাই হোক সন্ধ্যাবেলাটা আমার ছুটি থাকত; এ ছিল আমার সব চেয়ে সুবিধা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা লিও এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল, একজন নামজাদা এনার্কিষ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে। তাকে আমি জেরী বলেই পরিচয় দেবো। এতদিন এরা আমায় বলেছিল যে জেরী হচ্ছে এনার্কিষ্টদের আদর্শ পুরুষ; কাজেই তার কাছে যেতে হবে শুনে আমার মনে ভারী গোলমাল বেধে গেল।

আমি নেকটাইটা ঠিক করে নিচ্ছি এমন সময় লিও বলে উঠল—আরে তুমি যদি ফরসা কলার পরো তাহলে জেরী তোমার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ডই করবে না।

আমি শুনে অবাক হয়ে বল্লুম—কিন্তু রাস্তা দিয়ে কলার না পরে যাবো কি করে?

লিও বল্লে—দেখছ ত, তুমি আজও কি-রকম আসল বুর্জোয়া রয়ে গেছ। মহাজনী ব্যবস্থা সবায়ের কাছে যা দাবী করে তোমার মনের ওপর তার কি জোর ছাপ রয়েছে। তুমি আজও দাস, তাই তোমার কথায় দাস-মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে!

বিনা বাক্যব্যয়ে কলার না পরেই পথে বেরিয়ে পড়লুম। গন্তব্যস্থানে গিয়ে দেখি একটা সস্তা কফিখানার পিছনের ঘরে আলোর কাছে বসে পক্ককেশ একটি লোক বই পড়ছে।

আমাদের পায়ের শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে সে

বল্লে—ভাল ত—আমিই জেরী।

এর সম্বন্ধে আমি এত চমৎকার সব কথা শুনেছিলুম যে তার সামনা-সামনি হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম—মনে যেন সাহসের অভাব হ'ল। সে যে-হাত দিয়ে আমার করমর্দ্দন করেছিল তার মুঠোর জোরের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে এবং পরে যখন সে আমায় হুইস্কি দিলে (জীবনে সেই প্রথম হুইস্কি খেলুম), তখন এনার্কিষ্ট হয়েছি বলে আমার সারা দেহ-মন গর্ব্বে ভরে গেল। আস্ত একটা বোমা ছুঁড়ে কোন এনার্কিষ্টও বোধ করি তত গর্ব্বিত হয় না। হুইস্কির ফ্লাস্কটা আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে সে সেটি নিঃশেষ করলে এবং কথা সুরু হ'ল।

জেরী আমায় জিজ্ঞাসা করলে—এনার্কিজম তোমার এত ভাল লাগল কি করে?

আর বল্লুম—বাঃ, এই ত ভবিষ্যতের ছবি!

জেরী হেসে বল্লে—না, তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান না দেখছি। ভবিষ্যতের ছবি—ও কথা দুটি ত পুরো বুর্জোয়া বুলি প্রতি গির্জ্জায় রবিবারে রবিবারে এই বুলিই ত শোনা যায়। তুমি আদৌ এনার্কিষ্ট নও। এনার্কিষ্টরা কখনও বড় বড় কথা দিয়ে পুরানো বুলি আওড়ায় না। সে যাই হোক—তুমি ভারতবর্ষে ফিরে যাও না কেন? তুমি আজ যেসব সত্যের খোঁজ করছ, হাজার হাজার বছর আগে তোমার পূর্ব্বপুরুষরা তা লাভ করেছিলেন; বুদ্ধ হচ্ছেন বিশ্বের সকল এনার্কিষ্টের সেরা!

আমি খুব বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না—ঠিক বল?

জেরী—কেন করব না? আমি যেমন ছায়ামূর্ত্তি, ঈশ্বরও তেমনি একটি ছায়ামূর্ত্তি। কাজেই যেখানেই হোক সগোত্র দেখলেই সেলাম দেওয়া ভাল।

আমি বল্লুম—তুমি এনার্কিষ্ট ত বটে!

সে উত্তর দিলে—হ্যাঁ, যদি জীবনের সাতাশটা বছর এক কণা মাত্র কাজ না করে এনার্কিষ্ট হওয়া যায় তবে পৃথিবীতে আমিই একমাত্র এনার্কিষ্ট। গত সাতাশ বছর আমি কোন কাজ করিনি, কারণ আমি শিকাগো সহরে 'Haymarket' ব্যাপারে উপস্থিত ছিলুম। সেই বোমা ছোঁড়ার কথা জানো কি? পুলিশের লোকেরা রাস্তার লোকেদের ওপর বিস্তর জুলুম করেছিল—ব্যাপার কি হয়েছিল জানো? হতভাগাগুলো দিনে আট ঘণ্টা কাজ করবে বলে আন্দোলন করছিল—আমি তাদের সঙ্গেই ছিলুম—দেখলুম

পুলিশ খামকা লাঠি নিয়ে লোকেদের ঘাড়ের ওপর এসে ওড়ল। তারপর সেইহাজার-মানুষের ভীষণ হট্টগোলের মাঝখানে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হ'ল, আর মজুর-পুলিশ সবাই একেবারে নীরব নিস্পন্দ হয়ে গেল, এক মুহূর্ত্তের জন্যে পৃথিবী কেঁপে উঠল এবং আমিও ভাল করে বুঝলুম।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম—কি বুঝলে? তোমার মতের একটা দার্শনিক ভিত্তি বা অন্য কিছু নেই কি?

জেরী—না, সেই বিরাট শব্দ ও আগুনের ঝলকই আমার মতের আশ্রয়স্থল—সে শব্দটা যেমন তার পিছনের আশ্রয়, এখন মনে হয় সেটা তার সামনের আশ্রয় হোক।

আমার চোখের সামনে জেরী যেন কোন্ অতল গভীরতা থেকে বিরাট জলদেবতার মত আবির্ভূত হ'ল—সামনে তার বিরাট বিস্ফোরণ ও পিছনে তার মহা-বিদারণ কালভৈরবের প্রমথ সঙ্গীর মত বিরাজ করছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি কি করলে?

জেরী—সেইদিন থেকে আমি কোন কাজই করিনি। আমি ব্রত নিয়েছি যে সামান্য মাত্র অঙ্গ চালনা করেও আমি মহাজনী ব্যবস্থাকে এ জীবনে তিলমাত্র সাহায্য করব না।

তার কথা ঠিক না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার চলে কি করে?

কেন, লোকেরা আমায় খেতে দেয়—তুমি বলবে আমি ভিক্ষের ওপর, লোকের দয়ার ওপর বাঁচি—তাতে কি? তুমি যদি এনার্কিষ্ট হও তবে যাই ঘটুক তাতে তোমার গর্ব্বও থাকবে না, দীনতাও থাকবে না।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম—লোকেরা যা দেয় তাতে কুলোয় ত?

বিলক্ষণ, মানুষ এক অদ্ভুত রকমের দাস—হয় সে ভালবাসার দাস—নয় সে দয়ার দাস! তুমি যদি তার মনে সত্যি দয়া জাগাতে পারো, সে তোমার জন্যে সব করতে পারে!

জেরী বলতে লাগল—আমি ত আর কিছু করি না। শুধু লোকের মনে দয়া জাগিয়ে তুলি। এর জন্যে অবশ্য আমি তাদের ঘৃণা করি—আমি জানি আমায় উপলক্ষ্য মাত্র করে তাদের সে প্রবৃত্তি তারা চরিতার্থ করে; আমি তাদের কাছে কিছু নই অথচ সব সময়ে নিজেকে আমি অপরাধী মনে করে লজ্জিত হই।

আমি তাকে আর একটি প্রশ্ন করলুম—আচ্ছা, যখন তুমি মানুষকে এমনি করে ঘৃণা করো, তখনও কি মানুষের উন্নত ভবিষ্যতে তোমার বিশ্বাস থাকে?

জেরীর উত্তরটি ভারী চমৎকার—আমি লোক সাধারণকে ঘৃণা করি কিন্তু কোন ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা করতে পারি না। যখনই কেউ আমায় দয়া করে নিজের দুর্বলতা দেখায়, আমি তখন সাধারণ মানুষের কথা ভাবি; কিন্তু কেউ যখন উদ্ধত রূঢ় ব্যবহারে আমায় অপমান করে আমি তখন তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখি।

বিস্ময় ও আগ্রহে আমি বল্লুম—সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমি তোমার সঙ্গে যাবো, তোমার কাছেই আমি দীক্ষা নেব, জেরী।

জেরী—না, তুমি তা সহ্য করতে পারবে না।

কেন পারব না?

জেরী—মার খেতে খেতে জেলে যাওয়া, যার-তার কাছে লাথি-ঝাঁটা খাওয়া, আর কখনও বা কারোর দয়ায় প্রচুর খেতে পাওয়া যে কী ভয়ানক তা তোমার ধারণা নেই। তুমি কখনও সাতাশ বছর ধরে এসব সহ্য করতে পারতে না। তোমাদের দেশে ধর্মের অঙ্গ বলে প্রচার করে ভিক্ষাবৃত্তিকে উন্নত স্থান দিয়েছে, কিন্তু এদেশে ভিক্ষাকে আমরা এত হেয় অপরাধ মনে করি যে চোরও এ কাজ করতে লজ্জা ও অপমান বোধ করে। তুমি পারবে না—তোমাদের দেশে ভিক্ষা ধর্মাচারের অঙ্গ, কিন্তু এখানে তুমি ভিক্ষা করতে পারবে না—কোন কালেই না।

জেরী কখনও ভারতবর্ষে গিয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করলুম।

সে জানালে—না যাইনি, কিন্তু তাকে উপলব্ধি করা যায়। প্রাচীন হিন্দুদেরও আমি বেশ বুঝতে পারি। তাঁদের সাহিত্যের টুকরো-টাকরা মাঝে মাঝে পড়ে দেখেছি এবং আমার খুব মনে হয়েছে যে তাঁরাই হচ্ছেন বিশ্বের আদিম এন্যার্কিষ্ট। তোমারই পূর্ব্ব-পুরুষদের একজন না বলেছিলেন—"নেতি, নেতি, নেতি?"

আমি সে কথা স্বীকার করায় জেরী আমার উপর গর্জ্জন করে উঠল—তবে মরতে এখনে এখানে এনার্কিষ্ট হতে এসেছ কেন? আমি যে এনার্কিষ্ট হয়েছি তার কারণ আমি দল চালাতে চাই—উদাহরণস্থল হতে চাই না।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাও?

জেরী—বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ভীষণতার জ্ঞান যাতে বাড়ে সেই পথে; জীবনের নিশ্চিন্ত আরাম থেকে বীরত্বের পথে তোমাদের নিয়ে যেতে চাই।

তাকে নমস্কার করে সে-রাত্রে আমার ছোট বাসাটিতে ফিরে এলুম। পরদিন তার সঙ্গে আবার দেখা হ'ল এবং বিস্তর আলোচনা চল্‌ল আমার তখনও দৃঢ়

বিশ্বাস ছিল যে এনার্জিকমের ভিতর দিয়েই মানুষ উন্নততর অবস্থায় পৌঁছবে—আমি মানতুম যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় চরিত্র গড়ে ওঠে, সুতরাং সে অবস্থার বদল হলে পৃথিবীর উন্নতি হবেই।

জেরীকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা, ডারউইন যে বলেছেন বাঁদর থেকে মানুষ হয়েছে, একথা তুমি সত্যই বিশ্বাস কর?

জেরী বল্লে—আরে ও কিছু নয়—আমার কি ভয় হচ্ছে জানো—মানুষ দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে বাঁদর হয়ে পড়ছে!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিবর্ত্তনকেই তো তুমি সভ্যতা বলে স্বীকার করো!

আমাদের সঙ্গে গর্ডন বলে একজন সোশিয়ালিষ্ট ছিল, সে বল্লে যে উক্তিটা স্পেনসারের।

জেরী—আরে তোমার স্পেনসার আবার কে? গর্ডন যদি তার উক্তি উদ্ধার করে তবে তাতে কিছু নেই নিশ্চয়ই।

গর্ডন খুব রেগে গিয়ে তর্ক সুরু করলে। লোকটা একগুঁয়ে হয়ে কেবল কথা কাটাকাটি করতেই পারে—বক্তব্য তার বিশেষ কিছুই ছিল না। "যদি কথা বলে জিততে চাও তবে তোমারই জিত" বলে জেরী একেবারে মুখ বন্ধ করলে।

গর্ডন আবার বল্লে—প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত পরিবর্ত্তন সাধনই সভ্যতা।

জেরী বল্লে—না—আচ্ছা, একটা গল্প বলি শোন—তারপর আমায় দেখিয়ে বল্লে—এরই এক পূর্ব্বপুরুষ এক নদীর ধারে এসে হাজির হ'ল। ভরা নদী ভয়ঙ্কর বেগে বইছিল—সে লোকটি প্রণাম করে বল্লে—"মাতর্গঙ্গে, তোমার অপরূপ ভীষণতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমি তোমার কূলে বাস করব।" স্রোতের বেগে কূল ভেঙ্গে একদিন তার কুড়ে ঘরটি নদীগর্ভে অদৃশ্য হ'ল—লোকটি আবার একটি ঘর তুল্লে। এমনি করে সে নদীর ভীষণতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে লাগল। কিন্তু এই বৃদ্ধ হিন্দুর এক প্রপৌত্র একদিন দেখলে যে নদীর জলে একটা কাঠের গুড়ি ভেসে যাচ্ছে। তাই দেখে তার মাথায় এক নতুন ফন্দি এল; সে এক সঙ্গে সাত আটটা কাঠ বেঁধে একটা ভেলা তৈরী করে নদী পার হ'ল। তুমি বলবে যে সে-ই সভ্যতা সুরু করলে। বেশ, তাতে আমার অমত নেই। কিন্তু একে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ত্তন বলে কেমন করে চালাবে? না, এর ঠিক নাম হচ্ছে আত্মসাৎ করা। লোকটি নিজের প্রয়োজনে

নদীকে আত্ম-প্রয়োজনে নিয়োগ করল। দেখ্‌লে ত তোমার স্পেনসার লোকটি ভুল বলেছেন।

গর্ডন—আরে তোমার ও হিন্দু গাঁজাখুরী গল্প রাখো। হিন্দুর মত নিরেটরা তাতে খুশী হতে পারে কিন্তু আমি তাতে ভুলি না—যুক্তিপ্রমাণ চাই।

জেরী—ভাবুক জাতের কাছে পুরাণই ন্যায়শাস্ত্র, আর নিরেট লোকেরা ত ন্যায়শাস্ত্রকেই পুরাণ বলে মনে করে।

গর্ডন খুব রেগে বেরিয়ে গেল।

আমি জেরীকে বল্লুম—আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না যে গর্ডনের কথা সত্যিও হতে পারে?

জেরী বল্লে—এই সোশিয়ালিষ্ট হতভাগাদের জীবনে একটা অভিশাপ এই যে এরা সব সময়ে সত্যি কথাটাই বলে। ভুল বলবার তাদের সাহসই নেই। কিন্তু গর্জনের কথা যাক—এরা সমস্তক্ষণই তর্জ্জন-গর্জ্জন-চীৎকার নিয়েই আছে। কোন কালেই বুঝবে না যে জিনিসটা খুবই গভীর—সন্দেহমূলক পদ্ধতি দিয়ে বিশ্বাসমূলক পদ্ধতিকে জয় করা যায় না।

এ-সময় জেরী বা লিও কেউই একটি পয়সা রোজগার করছিল না—আমার মাইনের কুড়ি ডলার পাবার সময় হয়েছিল। নিয়মমত বাড়ীওয়ালী পাঁচ ডলার কেটে নেবার পর তা থেকে তাদের পাঁচ ডলার দেবার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু না দিয়েও আমার উপায় কি?—তারা আমার মানসিক উন্নতির জন্য সত্যই পরিশ্রম করছিল। সারাদিন তারা পড়ত আর রাত্রে আমায় সেই সব কথা বোঝাত। এমনি করে তাদের কাছে হেগেল ও হিউমের দর্শন পড়লুম—নানারকম সামাজিক মতবাদের খবর, তাদের বিভিন্নতা, বিশেষত্বের কথাও জানলুম

একদিন মাইনের পনের ডলার নিয়ে লিওর কাছে এলুম; সে বল্লে—আমরা একটা কাজ পেয়েছি এবং নিতে রাজী হয়েছি। আমরা Industrial Worker of the World এর (বিশ্ব-কর্ম্মী-সংঘ) তরফ থেকে বক্তৃতা দেবো। সোশিয়ালিষ্ট দলের এই শাখার সঙ্গে আমাদের মতের অনেক মিল আছে। তারা এর বদলে তাদের হল ঘরটায় আমাদের শুতে দেবে। রাস্তায় আর আমাদের ঘুরতে বা ঘুমোতে হবে না—বাঁচা গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তোমরা কি করবে?

লিও বল্লে—আমাদের কাজ হচ্ছে সপ্তাহে দুদিন রাস্তার মোড়ে মোড়ে

বক্তৃতা দেওয়া। তা দেখ, দাঁড়াবার জন্যে কাঠের বাক্সটা তুমি নিয়ে যাবে কি?

আমি স্বীকৃত হলুম—বেশ ত, মহাজনী বন্দোবস্ত ধ্বংস করতেই হবে; আমি বাক্স বয়েই তোমাদের সাহায্য করব।

প্রথম বক্তৃতার দিন এল; বাড়ীওয়ালীর কাছ থেকে একটা প্যাক বাক্স চেয়ে নিয়ে কিলমোরষ্ট্রিটে গেলুম। বাক্সটা ট্রামে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম। লোকেরা আগে মনে করেছিল যে তার মধ্যে বেড়াল জাতীয় কিছু আছে কিন্তু যখন বুঝলে যে বাক্সটা খালি তখন আমার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল, যেন তারা বল্‌তে চাইল যে বাক্সের মত আমার মগজটিও খালি। অবশেষে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে বাক্সটি রাস্তার কোণে রাখ্‌লুম।

লিও তার ওপর দাঁড়িয়ে উঠল—রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সমাজ এই তিন আমি লোপ করতে চাই! তার কথার একটি মাত্র শ্রোতা জুটল। আমি মনে মনে বল্লুম—ঐ তিনটি লোপ করে যদি ও একটি লোক পায় তবে বেশী লোক পেতে ও আর কি লোপ করবে? তা ছাড়া লোপ করবার আর রইলই বা কি?

শ্রোতা লিওকে বল্লে—দেখ, তুমি কে বল ত?

লিও—আমি একজন এনার্কিষ্ট।

শ্রোতা—বুঝেছি, কি বলছিলে বল এবার।

লিও—বলে কি হবে? আরও জনপাঁচেক লোক নিয়ে এস দেখি ত?

দীক্ষাগ্রহী লোকটি তাতে রাজী হ'ল। সে পরামর্শ দিলে, আমার কথা শোন, কোন কথা না বলে আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি এস। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম। লিওর দিকে ফিরে দেখি সে বাক্সের ওপর মূর্ত্তির মত সোজা দাঁড়িয়ে আছে! এ ফন্দিতে খুব কাজ হ'ল। বিস্তর লোক ক্রমে ভিড় জমাতে লাগল। লিও হঠাৎ তাদের দিকে হাত ছড়িয়ে আঙুল বাড়িয়ে বল্লে—এই তোমরা সবাই রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সমাজকে পরিপোষণ করছ। লোকগুলো একটু ভয় পেলে কিন্তু খুব উৎসুক হয়ে উঠল।

তারপর লিও তার বক্তৃতা সুরু করলে। তার কথা শুনে লোকেদের আগ্রহ ক্রমেই বাড়তে লাগল। প্রায় দু'ঘণ্টা বক্তৃতা করার পর লিও খুব গম্ভীরভাবে জানালে, এবার আমার হিন্দু বন্ধু আপনাদের কাছে টুপি নিয়ে যাবেন! আমি দেখলুম, ভিড়ে ভাঙ্গন লাগল এবং বেশীর ভাগ লোকই রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। যারা ছিল তাদের কাছ থেকে প্রায় দেড় ডলার আদায় হ'ল। লিও তখন ঘোষণা করলে—আজকার সংগ্রহ খুবই সন্তোষজনক হয়েছে। আগামী সোমবার

রাত্রে আবার আপনাদের কাছে কথা বলতে চাই, সেদিন আমার বন্ধু জেরী "বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন।

কিন্তু সে সপ্তাহ শেষ হবার আগেই অনেক কিছু ঘটে গেল। এর মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ব্যাপারটি হচ্ছে যে, বাড়ীওয়ালী একদিন সন্ধ্যাবেলা আমায় বল্লে, দেখ, আমরা খুব দরকারী কাজে বাইরে যাচ্ছি, তুমি আজ বাড়ীতে থেকে টেলিফোনটা ধরবে কি? কি করি, সে রাত্রে বাড়ীতে থেকে টেলিফোনের খবরদারি করলুম। তারপর উপ্‌রি উপ্‌রি দু'রাত একই অনুরোধ চল্‌ল আর আমিও বাড়ীতে রয়ে গেলুম। এক সপ্তাহের মধ্যে এটা ধরে নেওয়া হ'ল যে সন্ধ্যেবেলা টেলিফোনের খবরদারি করা আমার নিত্য কাজেরই একটা অঙ্গ। কাজটা ছেড়ে দিতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না—একে ত কাজটা ভালই, তার ওপর সন্ধ্যা থেকে ছুটি ছিল। কিন্তু দিনের শেষে কাজ দিয়ে এরা লিও ও জেরীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ প্রায় অসম্ভব করে তুল্লে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা জেরীকে এ-কথা বল্লুম। সে বল্লে—তুমি কাজটা কোনমতেই ছেড়ো না। আমাদের কারুর কোন রোজগার নেই জানো ত!

আমি বল্লুম—বেগার খেটে খেটে বিরক্ত হয়ে গেছি যে।

জেরী—তাহলে আর কি করবে, ছেড়ে দাও। আমার তাতে কিছু এসে যাবে না। তবে আমার কথা শোন, হাতে কিছু জমাও।

এদের ব্যবহারে আমি দিন দিন ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠছিলুম, তাই একদিন যখন বাড়ীওয়ালী বল্লে—দরকারী কাজে আমরা বাইরে যাচ্ছি, তুমি টেলিফোনটা দেখো, আমি বল্লুম—উঁহু, আমারও বাইরে কাজ আছে, এখনি যেতে হবে। টেলিফোন দেখলে চলবে না, যেতেই হবে।

সে বল্লে—তাহলে কাল জন্মের মত এ বাড়ী ছেড়ে যেও।

আমিও জেদ বজায় রাখলুম, বল্লুম—বেশ, কাল কেন, আজ রাতেই যেতে চাই। বেরিয়ে পড়ে আমি লিও ও জেরীর কাছে গেলুম। সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে সে-রাত্রে খুব গরম আলোচনা হ'ল।

জেরী বল্লে—সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মূলে আছে ভয়।

লিওর ধারণা—সে সম্বন্ধের ভিত্তি হচ্ছে অজ্ঞানতা। মানুষ যতই জানে, ততই অসামাজিক হয়ে ওঠে।

আমি বেশ বুঝলুম যে মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধের ভিত্তি বা কারণ দু'জনের আদৌ জানা নেই। বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে ঝগড়া করে সবেমাত্র চলে

এসেছি, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটি অতি সূক্ষ্ম, কারণ কাজটি ছাড়বার তখন আমার মোটেই ইচ্ছা নেই। জেরীকে ব্যাপারটা সব খুলে বল্লুম। সে বল্লে—দেখো, কাল তোমার চাকরী থাকবেই। তোমায় তারা ছাড়বে না—তোমার মত অতি বাধ্য একটি নিরেট লোক তারা আর কোথায় পাবে বল? তোমার মধ্যে খুব মুখ বুজে সহ্য করবার শক্তি আছে, কিন্তু সেইটাই তোমার দোষ।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরে ঘুমোচ্ছি এমন সময় মনে হ'ল কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। জেগে উঠে শুনলুম, কে একজন দরজা ঠেলছে আর গালাগালি করছে। প্রথমে খুব ভয় পেলেও, ব্যাপারটা শীগ্‌গীরই বুঝেত পারলুম! আমি যে টেলিফোন ধরতে অস্বীকার করেছি সে কথা বাড়ীওয়ালী তার মাতাল ছেলেকে বলে দিয়েছিল; সে বাড়ী ফিরে আমায় বাইরে বার করে দেবে বলে সারারাত তর্জ্জন-গর্জ্জন করলে, কিন্তু আমায় ত বাগে পেলে না। সকালে উঠে যখন দরজা খুলে বেরলুম, তখন দেখি সে দরজার পাশে মেঝেতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি বাড়ীওয়ালীকে ডেকে আনলুম এবং দু'জনে ধরাধরি করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। এর মধ্যে একবার জেগে সে আমায় বল্লে—হতভাগা কাফের, তোর মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে দেবো। তখনই আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি বুড়ীকে বল্লুম—আমি আর কাজ করব না, আমায় তোমরা অপমান করেছ—তোমার ছেলে সারারাত আমার দরজার কাছে চেঁচামেচি করেছে, আর হতভাগা কাফের বলেছে।

বুড়ী বল্লে—আমি ত একে অপমান বলে মনে করি না।

আমি বল্লুম—তবে কি করলে অপমান হয় শুনি।

বুড়ী বল্লে - সে যদি তোমায় মারত তাহলে বলতুম অপমান করেছে বটে।

আমি কাজে ইস্তফা দিলুম; মার খাবার জন্যে ত আর অপেক্ষা করতে পারি না।

এইবার জীবনে একটা ভারী দুঃসময় এল। কোথাও একটা কাজ জোগাড় করতে পারলুম না। বিশ্ব-কর্ম্মীসংঘের ঘরে আমরা রাত্রে ঘুমোতে পেতুম কিন্তু এই সুবিধে নেবার জন্যে আমার বন্ধুদের সপ্তাহে চারটি বক্তৃতা দিতে হ'ত। লিও বলত—নেহাত বাজে আর আত্মম্ভরী লোক ছাড়া আর কেউ সপ্তাহে চারটে বক্তৃতা দিতে পারে না। যাই হোক, ফলে দাঁড়াল এই যে বন্ধুরা যেখানে বক্তৃতা করতে যান আমি বাক্স ঘাড়ে করে সেখানে হাজির হই। দলের কেউ

যখন ধর্ম, রাষ্ট্র, বিবাহ বা কিছুর উচ্ছেদ করতে চান তাঁর নেকনজর পড়ে আমার ওপর। কারণ বাক্সের সঙ্গে আমার সত্তা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। তারপর জেরীর সঙ্গে বিশ্ব-কর্মীসংঘের মনান্তর নিয়ে মতান্তর হয়ে গেল। জেরী বলত যে কর্মীর হাতে কল-কারখানার ভার কোন মতেই থাকতে পারে না, কারণ সেটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অনুযায়ী নয়। আর কর্মীসংঘের কর্তারা জেদ করতেন যে জেরী যেন বক্তৃতায় কর্মীদের এই শাসনের অধিকারের কথা আলোচনা করেন। জেরী অস্বীকৃত হতে তারা বল্লে—তা হলে তোমরা আর এখানে ঘুমোতে পাবে না।

জেরী বল্লে—ভালই হলো, তোমাদের পোকা-মাকড়ের হাত থেকে মুক্তি পেলুম।

তারা বল্লে—বেশ, আমাদের পোকা-মাকড় আমাদের থাক, তোমরা সরে পড়। কাজেই আমরা তিনজনেই সে স্থান ত্যাগ করলুম। আসবার সময় কাঠের বাক্সটা তাদের দিয়ে এলুম, কারণ ঘুমোবার জায়গার জন্যে আর আমাদের বক্তৃতা করবার দরকার ছিল না।

সারারাত না ঘুমিয়ে পথে পথে চলে বেড়ানোনোর কতকগুলো, বিষম অসুবিধা আছে। অবশ্য পার্কে সারাদিন আমরা পড়ে পড়ে ঘুম দিতুম। ক্যালিফোরনিয়ায় তখন গরম পড়েছে; বৃষ্টি ছিল না। কিন্তু পুলিশের লোকের অত্যাচারের আর অন্ত নেই। দেখলুম তারা সর্ব্বক্ষণই আমাদের ঘাড়ে একটা না একটা দোষ চাপিয়েই আছে। তা ছাড়া একটা না একটা দোষ চাপিয়েই আছে। তা ছাড়া তাদের সেই একঘেয়ে বুলি "চলো চলো"—কোথাও জমিয়ে বসতে দেবে না—আমাদের একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে।

একদিন জেরী মতলব করলে যে আইরিশ জাতীয় আন্দোলন, ফিনিক্স-পার্ক হত্যাকাণ্ড এবং পার্নেল প্রভৃতির প্রসঙ্গ তুলে পার্কের একটা পুলিশম্যানের সঙ্গে আলাপ জমাবে। তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল না। সেদিন থেকে আইরিশ পাহারাওয়ালাটা আমাদের বন্ধু হয়ে গেল এবং বাগানের একটা বড় ঝোপের তলায় দু'খানা বেঞ্চে আমাদের শোবার স্থান হ'ল—এতদিন যারা তাড়া দিয়ে জীবনান্ত করছিল তারা আর কেউ বিরক্ত করলে না।

এদিকে ঘুমের চেয়ে খাদ্য সংগ্রহের বন্দোবস্ত নিতান্ত অনিশ্চিত হয়ে উঠল। আমরা তখন ঠিকে কাজ করতুম অর্থাৎ আমি কাজ করতুম আর জেরী ও লিও বেঞ্চে বসে পড়ত। একটা বইয়ের দোকানে কাজ পেলুম, দোকানটা

সোশিয়ালিষ্টদের। সেখানে দোতলায় পুরানো বই ঝাড়তাম আর তার হিসেব রাখতুম। দিনে আমার প্রায় ঘণ্টা তিনেক খাটতে হ'ত। কিন্তু এই সোশিয়ালিষ্টরা এমন কৃপণ যে আমায় ঘণ্টায় পঁচিশ সেণ্টের বেশী দিত না। যখন আমার হাতে পঁচাত্তর সেণ্ট জমত আমি আর কাজ না করে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে খেতে যেতুম।

জেরী একদিন বল্লে—দেখ খাওয়ার অভাবে সবায়ের শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়বে, কাজেই আমাদের মধ্যে একজনকে কাজ করতেই হবে।

আমি শেষটা বেরিয়ে পড়লুম এবং একটা কাজও পেলুম। এবার খাওয়া-থাকা ছাড়া মাইনে হ'ল পঁচিশ ডলার আর কাজ ছিল আগের বাড়ীর মত। কাজেই কোন গোল হ'ল না। কিন্তু বাড়ীটা একটু রহস্যময় মনে হোল; কতকগুলো সন্দেহজনক লোক কেবলই যাওয়া-আসা করত এবং কেউই এক সপ্তাহের বেশী সেখানে থাকত না। সুতরাং এক সপ্তাহ কাজ করে মাইনে নিয়ে আমি জেরী ও লিওর কাছে ব্যাপারটা সব বল্লুম। তারা বল্লে—জায়গাটা যত সন্দেহজনক হবে, ততই তোমার পক্ষে সুবিধে, কারণ লোকগুলো তোমার কাছে খুব ভাল কাজ দাবি করবে না অথচ বক্‌শিশও পাবে, সময়ও পাবে। লোকগুলো হয়ত দুশ্চরিত্র, আর তুমি তো জানো দুশ্চরিত্র লোক মাত্রেই বেশ একটু মুক্ত-হস্ত হয়ে থাকে।

তারা ঠিক কথাই বলেছিল। এরা যেমন সহজেই খুশী হ'ত পয়সাও দিত তেমনি বেশী। একজনকে আমার খুব ভাল লেগেছিল, তিনি বিধবা এবং নিজের আয়ে থাকতেন। সারা বোর্ডিংয়ে তিনিই কেবল সমস্ত সময় সেখানে বাস করতেন। একদিন দেখি যে সকালের খাবার সময় তিনি লকের (Lock) On Human Understanding পড়্‌ছেন। নিজেকে দমন করতে না পেরে আমি বলে ফেললুম—আপনি লকের লেখা বুঝতে পারেন?

এর মানে কি? তিনি বলে উঠ্‌লেন—মনে হ'ল খুব চটেছেন।

আমি তাঁকে শান্ত করবার জন্যে বল্লুম—দেখুন, জেরী আমায় বলেছিল যে বইটা খুব গভীর। যাই হোক্, আরম্ভটা খুব খারাপ হলেও তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছিল; তাতে যেমন সুখ পেয়েছি, জ্ঞান-সঞ্চয়ও করেছি তার চাইতে কিছু কম নয়।

একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—বিবাহ-বন্ধন লোপ করা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

তিনি উত্তর দিলেন—আমার বেলা তাই তো করেছি—আমি তো বিধবা নই, আমি ডাইভোর্স নিয়েছি।

জীবনে এই প্রথম একজনের সঙ্গে কথা কইলুম যে সত্যিই ডাইভোর্স নিয়েছে। কাজেই তাঁকে যে কি বলব তা প্রথমে ভেবে পেলুম না। থামকা জিজ্ঞেস করলুম—আচ্ছা, এ অবস্থায় কি রকম মনে হয়?

তিনি বল্লেন—মনে হয় যেন মুক্তি পেয়েছি। তুমি বলবে কি থেকে মুক্তি পেলুম? তা ঠিক করে আমি বোঝাতে পারব না, কিন্তু একদিন আমার সব কথা তোমায় বলব; কোন মিথ্যার মধ্যে আর জীবন কাটিয়ো না।

আমি মুখস্থ-মত বল্লুম—মানুষ যে মিথ্যার মধ্যে বাঁচে তা শুধু এই মহাজনী বন্দোবস্তের দোষে।

তিনি বল্লেন—তা তুমি যেমন বোঝো। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি Ibsen-এর Ghosts পড়েছ? সেই নাটকে একটি মেয়ে যে বহু বৎসর ধরে মিথ্যার মধ্যে বাস করেছিল, সেই কথাই আছে।

এই কথায় আমি ইবসেনের বই পড়তে সুরু করলুম এবং দেখলুম যে তাঁর The Doll's House-এর সঙ্গে Ghosts নাটকের বিষয়-সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। ইবসেনের উপর আমার শ্রদ্ধা খুবই বেড়ে গেল। কারণ এই মহিলার জীবনে তাঁর মতের জীবন্ত প্রমাণ পেয়েছিলুম।

জেরীকে যখন আমার এই নতুন মহিলা-বন্ধু ও ইবসেনের কথা বললুম, সে বল্লে যে ইবসেন পুরানো হয়ে গেছে। তার কথায় ইবসেন কোন কিছু সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হতে পারেননি; তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নই উঠিয়েছেন এবং শেষকালে তাঁর প্রশ্ন সম্বন্ধে সন্দেহও জন্মেছিল। তবে একথা ঠিক যে, গ্রীক নাট্যকার সফোক্লেশের পরে ইবসেনের মত কারো রচনা এত সরল নয়।

পরের দিন আমরা সফোক্লেশের বই নিয়ে পড়তে সুরু করলুম।

দু'তিন দিনে যখন আমাদের পড়া শেষ হলো জেরী বল্লে—দেখ্‌লে ত, এর সঙ্গে তুলনায় সেকস্‌পীয়ারের রচনা একটা মুখ্যুর বাজে বকুনি বলে মনে হয় না কি?

আমি বল্লুম—সেকস্‌পীয়ার আবার কি দোষ করলে?

জেরী বল্লে—না, দোষ আবার করবেন কি? কবে তাঁর একটা প্রকাণ্ড বিশ্বাস ছিল যে একই মানুষ দুটো জগৎ বজায় রাখতে পারে। তিনি পৃথিবীর সঙ্গে যেমন রফা করেছিলেন, স্বর্গের সঙ্গেও সেই মত রফা করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেকস্‌পীয়ার এ-জগতের ব্যবস্থা যেমন দেখেছিলেন তেমনি মেনে নিয়েছিলেন, অন্তর জগতের অবস্থার সঙ্গে বনিয়ে চলেছিলেন। তিনি কোনদিন বুঝতে পারেন নি যে ও দুই

ব্যবস্থাই সরল করা বিশেষ দরকার। কিন্তু সফোক্লেশ এ-দুয়ের মিলন সাধন করতে পেরেছিলেন।

আমি আবার তাকে ইবসেনের কথা বলতে জেরী বলেছিল—গ্রীকের মত সমৃদ্ধ ভাষায় যদি রচনা করতে পেতেন এবং সক্রাতেশ ও পেরিক্লেশ প্রভৃতির মত সমকর্মীদের সঙ্গে থাকতে পেতেন, তবে ইবসেন তাঁদেরই মত নিশ্চয়ই বড় হতে পারতেন! কিন্তু ইবসেনের দুর্ভাগ্য যে ষ্ল্যাড্‌স্টোনের মত লোকেরাই তাঁর সময়ে জন্মেছিল। কিন্তু দেখ, তোমার পূর্বপুরুষরা এসব কথাই জানতেন এবং সেই জন্যে তাঁদের কোন কষ্টও পেতে হয়নি। তোমার নিজের ঘরে যা আছে তার সন্ধান করতে তুমি আমাদের কাছে এসেছ মনে হলে আমার খুব আশ্চর্য বোধ হয়। তোমার এবার দেশে ফেরবার সময় এসেছে।

আমার ফেরবার সময় হয়েছিল বটে তবে দেশে নয়—কলেজে, কারণ গরমের ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এবার ইউনিভার্সিটিতে ফিরে জীবনটা ভারি নীরস মনে হ'ল। সেই একঘেয়ে প্রাণহীন পাঠ ও দিনের পর দিন শুষ্ক বক্তৃতার চাপে মনটা তিতো হয়ে গেল। সেসব বক্তৃতায় শিক্ষণীয় যে কিছু ছিল না তা নয়, কিন্তু কি জানি কেন আচার্য্যদের জ্ঞানোপদেশে আমার কোন আগ্রহ ছিল না।

মাঝে মাঝে লিও বা জেরী আমার সঙ্গে দেখা করে যেত। 'সীমেষ্টারের' শেষদিকে কলেজ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য আমার কাছে প্রকট হল। যে কোন ছেলের কাছে এ জীবনের সব চেয়ে বড় লাভ হচ্ছে পুস্তক-প্রীতি। অবশ্য সত্যিকার ভাল বইয়ের উপর ভালবাসা জাগানো অধ্যাপকের শক্তির বাইরে; ছেলেকে নিজেই এ ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হয়। জ্ঞানের পিপাসা তো কেউ দিতে পারে না, মানুষ নিজে থেকেই তা উপলব্ধি করে। যে-কোন দশখানার মধ্যে হয়ত একখানা আমার কাছে সত্যিকার বই বলে মনে হ'ত এবং যতই আমি বই থেকে বইয়ের মধ্যে পোকার মত মাথা গুঁজে চলতে লাগলুম, ততই ঠিক বইটি বাছবার মত একটা শক্তিও লাভ করলুম। একখানা ভাল বই পড়তে আমাকে হয়ত দশখানা বই দেখতে দেখতে হ'ত কিন্তু এমনি করে বেশী বই ঘেঁটে ঘেঁটে পড়ার পিপাসা আমার মিটে গেল—মনে হ'ত সব বইগুলো যেন বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে। একদল কলেজের অধ্যাপকদের 'মামী কেসে' রাখলে যেমন দেখায়, বইগুলোও তেমনি যেন মাথা-ভরা টাক ও চশমা-ঢাকা নিষ্প্রভ চোখ নিয়ে আমার সামনে সার

বেধে পড়ে থাকত।

খুবই আনন্দের বিষয় যে সে সীমেষ্টারে মৃতের প্রতি আমার সমস্ত প্রীতি নিঃশেষ হয়ে গেল। একদিন জেরী ও লিও আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। এ সময় আমি থাওয়া-থাকা ও মাসে দশ ডলার নিয়ে একটা বোর্ডিং হাউসে কাজ করতুম। আমার বন্ধুরা যখনই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত আমি তাদের নিয়ে আমার একতলার কুঠুরীতে আসর জমিয়ে বসতুম এবং সেখানে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা চলত। জেরীকে আমার মনের অবস্থার কথা জানালুম। আমি বল্লুম—বই-এর মোহ আমার কেটে গেছে।

জেরী বল্লে—বইগুলি হচ্ছে মহৎ চরিত্রের ছায়া মাত্র। যেদিন কোন নবীন মন মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করে, তখন তার বই পড়ার উৎসাহ বা আগ্রহ স্বতঃই কমে যায়। বই ত ছায়া ছাড়া আর কিছু নয় আর ছায়া ভাল লাগে শুধু ছোট ছেলেদের!

আমি প্রতিবাদ করলুম—সেক্সপীয়ার, সফোক্লেশের-এর রচনার মত বইও তো আছে।

জেরী বল্লে—তা আছে, স্বীকার করি কিন্তু পাহাড়কে যেমন বেশী দিন ভাল লাগে না, আজকের দিনে সেক্সপীয়ারের কোন নাটকও তেমনি ভালবাসি না। কারণ উভয়ই যেমন বিরাট তেমনই অনাবশ্যক বলে মনে হয়। অথচ নাটকের বাইরে সেক্সপীয়ার মানুষটি মনটিকে যেমন প্রশস্ত করে তোলেন তেমনটি আর কিছুতে হয় না। বইয়ের মধ্যে কি আছে না জেনেও তারা যে কি একথা জানবার মানসিক শক্তি যেদিন জন্মায় সেদিন বইগুলো মৃতের স্তূপ বলেই মনে হয়।

লিও বল্লে—বইয়ের আর একটা দিক আছে, তারা বাস্তব জীবনকে ভুলতে সাহায্য করে।

জেরী সে কথায় সায় দিলে—হ্যাঁ, বইগুলো প্রায় আফিমের মত। চীনেম্যানরা গুলি পাকিয়ে খায় আর আমরা তা কাগজের উপর ছড়িয়ে রাখি। একসঙ্গে তাল করে খেলেও যা হয় বর্ণমালা অনুসারে সাজিয়ে রেখেও আমাদের মনের উপর তার সেই ফলই হয়।

আমি এবার বল্লুম—আমি কলেজ ছেড়ে দেবো মনে করছি।

জেরী জেদ করতে লাগল—না, ছেড়ো না, ভবিষ্যতে একদিন মানুষ যেদিন সত্যই বেঁচে উঠবে, তখন এইসব দুর্গের লোকেরা মৃতের পক্ষ নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে এবং জ্যান্ত লোকেদের জন্য আমাদেরই এ মৃতের দুর্গ ধ্বংস

করতে হবে। এই সব জায়গার গুপ্ত রহস্য যারা জানে সেদিন তাদের খুব দরকার পড়বে।

আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছিল তাই প্রস্তাব করলুম যে তিন বন্ধুতে গিয়ে এক ডলারের বিনিময়ে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা যাক। দলের মধ্যে আমারই অর্থসম্পদ ছিল বেশী, কারণ ডলারটি ছিল আমারই পকেটে।

পথে বেরিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় খেতে বসেছি এমন সময় একটি লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এল, মাথায় তার ঘনদীর্ঘ সুন্দর চুলের ভার, মুখ তার সোনালী দাড়িতে প্রায় ঢাকা। টেবিলের কাছে এসে বল্লে—আরে জেরী যে, কেমন চলছে?

জেরী তার দিকে ঘুরে সবিস্ময়ে বলে উঠল—তুমি, ফ্রাঙ্ক! আমি ভেবেছিলুম তুমি অষ্ট্রেলিয়ার জেলে পড়ে আছ!

ফ্রাঙ্ক বল্লে—না, তারা আমায় ধরতে পারেনি আর আমি রাজনৈতিক অপরাধী বলে এঁরাও দয়া করতে পারেন নি। জেরী তখন তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে—তার নাম ফ্র্যাঙ্ক বনিংটান।

বনিংটান বল্লে—আচ্ছা এ ভোজে কি সবাই যোগ দিতে পারে?

আমাকে দেখিয়ে জেরী বল্লে—একে জিজ্ঞাসা করতে পারো, কারণ ভোজ দেবার শক্তি শুধু এরই আছে।

আমি বল্লুম—নব্বই সেণ্ট প্রায় খরচ হয়ে গেছে, দশ সেণ্টে যদি কিছু হয় ত দেখ।

সে বল্লে—খুব হবে, আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। আজ তিন দিন আমি কিছু খেতে পাইনি।

তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—অষ্ট্রেলিয়ায় তোমার কি হয়েছিল?

ও সেখানে দুটো সিণ্ডিক্যালিষ্ট ধর্ম্মঘট সুরু করেছিলুম আর একটা কারখানার কাজ ক্ষতি করেছিলুম (স্যাবোটাজ), তাই পুলিশ আমার নামে ওয়ারেণ্ট জারি করে। আমি আগে থেকে সে খবর পেয়ে মার্কিন জাহাজে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি। সিডনী ছেড়েছি প্রায় মাসখানেক আগে। জাহাজে যখন ধরা পড়লুম তখন প্রায় তিনদিন অনাহারে ছিলুম। তারা সামান্য কাজ দিয়ে খেতে দিত, পরে সানফ্রানসিসকোতে নামিয়ে দিয়েছে। আমি ভেবেছিলুম যে আমেরিকায় সোশিয়ালিষ্ট আন্দোলন খুব জোর চলছে কাজেই যে-কোন জায়গায় দলের লোক বা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

জেরী বল্লে—এখানে সোশিয়ালিষ্ট আন্দোলনের ত সেই বিপদই হয়েছে। কুকুরের গায়ে যত পোকা আছে আমেরিকায় তত সোশিয়ালিষ্ট জমায়েৎ হয়েছে।

আমি কথা প্রসঙ্গে ফ্র্যাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করলুম যে কাজ করতে গিয়ে তার জীবনে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা কিছু লাভ হয়েছে কিনা।

সে বল্লে—না, তেমন কিছু হয়নি, তবে একবার মাথার খুলি দু'জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছিল আর একবার বিস্তর স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলে-মেয়েদের একা আগলাতে হয়েছিল। কারণ সেই সব স্ত্রীলোকদের স্বামীদের পুলিশে গ্রেপ্‌তার করে ছিল। সেবার সব চেয়ে বিপদ হ'ল যে ছোট ছেলে-মেয়েগুলো দুধের জন্যে বায়না ধরতে লাগল আর মেয়েরা খাবারের জন্যে আমায় ব্যস্ত করতে আরম্ভ করলে, অথচ কোন কিছুই দেবার আমার উপায় ছিল না। সে দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেলুম গান গেয়ে। আমরা সকলে মিলে লা মারসেঈ (ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত) গাইতে লাগলুম আর সুরের উন্মাদনায় ক্ষিদের কথা একেবারে ভুলে গেলুম।

জেরী বল্লে—ভাঙ্গা মাথার খুলি নিয়ে তুমি ভাবো কি করে?

ফ্রাঙ্ক বল্লে—ওঃ, জীবনে কখনও এ-রকম পরিষ্কার করে ভাবতে পারিনি। ইচ্ছে হয় যে তোমার মাথার খুলিটা তিন জায়গায় ভেঙ্গে যাক, তাহলে আরও ভাল করে ভাবতে পারবে।

জেরী বল্লে—আরে, আমি তোমার ভাঙ্গা খুলির জন্য আপত্তি করছি না, আমি বলছি সোশিয়ালিষ্ট হয়ে এত পরিষ্কার করে ভাবো কি করে? সোশিয়ালিষ্টরা সব দিক গুছিয়ে ভাবে না, তারা যেটুকু জানে তাই জোর করে ভাবে।

ফ্র্যাঙ্ক খবর দিলে যে সে একখানা সোশিয়ালিষ্ট সাপ্তাহিক সম্পাদনের জন্যে মাসে আশী ডলারের এক কাজ পেয়েছে।

জেরী বল্লে—এবার তাহলে আমাদের বেশ চলে যাবে। তারপর আমাকে দেখিয়ে বল্লে—বুঝলে ফ্র্যাঙ্ক, এই ছোকরা কলেজের পড়াশুনা ছেড়ে আমাদের সঙ্গে ভবঘুরে হতে চায়, কিন্তু আমার মনে হয় ওর দ্বারা সে কার্য্য হবে না!

হোবো (hobo) হবার মত আমার যোগ্যতা থাক আর নাই থাক আমি যে কলেজে ফিরে যাবো না সে-কথা আমি জোর করেই জানিয়ে দিলুম। কারণ কলেজের জীবন নিতান্ত নীরস লাগছিল এবং মানুষের জন্য যে প্রাণ উৎসর্গ করতে চাই সে কথাও বল্লুম।

সব শুনে ফ্রাঙ্ক বল্লে—সব জীবনই নীরস এবং মাথার খুলি যদি প্রায়ই ফাটতে সুরু হয় তবে তাও নিতান্ত বিরক্তকর হয়ে উঠে। আর তুমি যে মানুষের জন্য

প্রাণ উৎসর্গের কথা বলছ, ও-কথা ভদ্রলোক ছেলে-ছোকরার মুখে এতবার শোনা গেছে যে তাতে ও-কথার কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই—দরকার হোক আর নাই হোক। আর যে মানুষের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে তাকে এত লজ্জাই বা কেন দাও বল ত?

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কিন্তু তুমি কি সে উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করনি?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—না, একটা স্বপ্নের জন্য আমি প্রাণ দিচ্ছি এবং আজীবন তারই পিছনে পিছনে ঘুরে মরছি। আমি ভদ্রঘরেই জন্মেছি—আমার পিতামহের অনেক ক্রীতদাস ছিল, আমার বাবা সেই ক্রীতদাসদের অধীনে রাখবার জন্যে অন্তর্যুদ্ধে (civil war) যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি আমায় শিক্ষার জন্য ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালেন যাতে আমি ভদ্রলোক হতে পারি, কিন্তু সেখানে বছর চারেক পরে আমি বেশ বুঝলুম যে আমি আদৌ ও-বস্তু হতে চাই না। কাজেই পূবদিক ছেড়ে পায়ে পায়ে পশ্চিমে ক্যালিফোরনিয়ায় এসে জুটলুম। খাবার খেয়ে দাম না দেওয়ার জন্য আমায় হোটেলওয়ালারা লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে—চোর সন্দেহে কত জায়গায় থানায় আমায় আটকে রেখেছে: জঙ্গালের টব থেকে কতবার খিদের জালায় খাবারের টুকরো খুঁটে খেয়েছি, আর পাহাড়ে জঙ্গলে যেখানে পেয়েছি খোলা আকাশের নীচে ঘুমিয়েছি। তাই তোমায় বলছি যে মানুষকে ভালবাসার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কারও ভাল করবার আমার যেমন ইচ্ছা ছিল না, নিজের উন্নতি করবার সাধও আমার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এক প্রেরণা-পত্র এল এবং আমায় বিশ্বাস করতে হ'ল যে মুক্ত আত্মার প্রসারের জন্য একটা উন্নত সামাজিক বন্দোবস্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমার খুব বিশ্বাস যে সেই উন্নত ব্যবস্থায় বর্তমান রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ সব ভেঙ্গে-চুরে লোপ পাবে—মুক্তিতে আমার এমনি ধ্রুব ভক্তি যে তার স্বপ্নের দাসত্ব-শৃঙ্খল আমার মনে চেপে বসেছে।

এইখানে কথার স্রোত নানা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'ল—বিশেষ করে পড়বার মত বই ও মেশবার মত লোকের কথাই হ'ল। শেষটা উঠল (Nietzche) নিট্‌জের আলোচনা। আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত হলুম যে নিট্‌জে নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান মহৎ মানুষের অনুসন্ধান করছিলেন এবং তাঁর সমসাময়িক লোকদের কাছে কেবলমাত্র নীতিবান ও সবল লোকের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে এত জোর দিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন যে লোকেরা তাঁর দৃঢ়তাকে সত্য বলে

ভুল করেছে।

জেরী এই বলে প্রসঙ্গ শেষ করলে—যাই বল, লোকটা ফাঁকা আওয়াজ করে বিস্তর। যদি সত্যিই তোমরা বলবান হও, তাহলেও নিজের জন্য যা-কিছু করতে চাও তা করতে পারো না। আর যদি নীতি না মেনে চল তবে কিছুদিন বাদে তোমাদের ভাল-মন্দর জ্ঞান একেবারেই লোপ পাবে—যেমন দেখ না এই জার্মান। সারা য়ুরোপ সে এই বলে মাতিয়ে বেড়াচ্ছে যে যদি নৈতিক শক্তিতে বলবান কেউ থাকে তবে সে নিজে সেই লোক, তার ফলে য়ুরোপের অন্য সবাই মনে করেছে যে লোকটা নীতিহীন না-হোক শক্তিহীন নিশ্চয়ই।

আমি বল্লুম—যদি আমরা সবাই ঐ কথা বলে দাঁড়াই তবে মানুষের কোন পরিবর্তন হবে না কি?

জেরী বল্লে—মানুষের কথা—রাম কহ! তোমার পূর্বপুরুষরা কি করেছিলেন? তাঁরা ভারতবর্ষের জঙ্গলে বসে ধ্যান করতেন আর তাঁদের চারিদিকে বড় বড় বাঘ হাতী চলে বেড়াত আর গঙ্গার জলের মধ্যে থেকে বড় বড় কুমীর মাঝে মাঝে মাথা তুলে আবার তলিয়ে যেত। তাঁরা কি কোন দিন সেসব গ্রাহ্য করেছেন? তাঁরা এমন সব সত্যের সন্ধানে ছিলেন যা তোমার সমগ্র মানব জাতির চেয়ে অনেক মহৎ, তাঁদের নিজেদের চেয়েও বিরাট এবং সেই জন্যই সত্যের অনুসন্ধানে তাঁরা মৃত্যুর কথাও ভুলে যেতেন। আর আমাদের কি বিপদ হয়েছে জানো—আমাদের জীবন যেমন সামান্য, সত্যও তেমনি সঙ্কীর্ণ। আমরা যেন সব স্বাস্থ্য-নিয়ম-সঙ্গতভাবে তৈরী শূয়ারের খোঁয়াড়, রাজ-পরিদর্শনের অপেক্ষায় খোলা পড়ে আছি। এই যে মানবতার কথা বলছ এর কোন কিছুই তোমার জানা নেই। কোটি কোটি লোকের বুকে যে স্পন্দন চলছে তার ক'টার হিসাব রেখেছ? মানুষের জীবনের হাজার হাজার বছরের ক'টা বছরের খবর করেছ শুনি? আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে মানুষ যে মর্মান্তিক কষ্ট পাচ্ছে তার মধ্যে ক'টা লোকের দুঃখ-মোচনের মত আমাদের বুকের পাটা আছে বল ত? অথচ এইখানে বসে আমরা মানুষের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করব বলে বড়াই করি—সত্যের জন্য প্রাণ বলিদানের স্বপ্ন দেখি! এই প্রাণ বলিদান শুনলে আমার গা জ্বালা করে—এ যেন আমাদের অনুগ্রহ। মানুষকে অনুগ্রহ করতে চেও না, তার চেয়ে রূঢ়তা আর কিছু নেই!

আমি বল্লুম—বেশ, তাহলে সব কথা খুলেই বলি। আমার কাজটি যাবার দাখিল হয়েছে। আমার মনিবরা খরচ বাঁচাতে চায় তাই আমায় জবাব দেবে বলেছে। তা আর কলেজে গিয়ে কি করব?

ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞাসা করলে—কলেজে তোমার কত খরচ লাগে?

আমি বল্লুম—মাসে চল্লিশ ডলার।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—বেশ, আমার মাইনের অর্দ্ধেক তোমায় দেবো, তুমি তাই নিয়ে কলেজে যাও আর বাকি চল্লিশ ডলারে জেরী, লিও ও আমার খরচ চালিয়ে নেবো।

এ প্রস্তাব শুনে আমি ভয়ানক অভিভূত হয়ে গেলুম এবং মত ফেরাবার জন্য বল্লুম—তার কি দরকার বল? কলেজে যাবার আমার কোন প্রয়োজন নেই। সেসব পণ্ডিতের সাহায্য না নিয়েও তো তোমরা কত কি শিখেছ।

নিজের সুখ-সুবিধা অগ্রাহ্য করেও সে আমায় পড়াবার জেদ বজায় রাখলে। সে বল্লে—সব জিনিস আর জায়গার চেয়ে কলেজটাই ভালো—সেখানে তোমায় কিছু ব্যথা না দিয়ে তোমায় জ্ঞান দেয় কিন্তু এই ভবঘুরে জীবন হচ্ছে জ্ঞানলাভের সব চেয়ে কঠিন পথ। এ-পথে দুঃখের অন্ত নেই, কারণ একবার যে এ পথে নেমেছে তার আত্মসম্মান খর্ব ত হয়ই, ক্রমে ক্রমে সে জ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়। জানো, অনেক সময় কিছুদিন ধরে না খেতে পেয়ে আর খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আমি রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাবার চেয়েছি, দস্তুরমত খাওয়ার শেষে তারাও আমার কাছে দাম চেয়েছে—শেষটা কি হয়ে থাকে সে কথা ত জানো। ফ্র্যাঙ্ক শুধু তার হাতটা নাড়লে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—শেষটা কি হয়ে থাকে বল্লে না?

ফ্র্যাঙ্ক একটু ঘাড় নেড়ে আমায় বোঝালে—আমি তাদের আমায় লাথি মেরে রেস্তোরাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে নিজেকে সমর্পণ করতুম আর তারা খুব খুশী হয়েই তা করত। এবার বুঝেছ ত 'হোবো' হওয়া কাকে বলে। এর ফলে জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদটি হারাতে হয়—কোন কিছুর উপরে আর বিশ্বাস থাকে না, নিজের মহত্ত্বের উপরেও না।

আমি প্রশ্ন করলুম—এত সব কষ্ট দুর্ভোগের মধ্যে তুমি কেমন করে বেঁচে থাক।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—জীবনকে যেন তোমার বাইরে সরিয়ে রাখতে হয়। তুমি সেই সুদূর ভবিষ্যতের ধ্যান করছ এবং সেই যুগে বাঁচছো যখন মানুষ দেবতাদের মত বিরাট ও মহৎ হয়ে উঠবে এবং সেই সুদূর ভবিষ্যতে তোমার জীবনধারা অক্ষুণ্ণ চলছে বলে বর্তমান স্থান ও কালকে তুমি আমলই দিতে পারো না। তোমার বুদ্ধি এই ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের এক সুন্দর আবরণ গড়ে তোলে যা সব সময়ে বক্ষের মত তোমার আত্মাকে ঢেকে রাখে।

জেরী বলে উঠল—তা বৈকি, নিজে যে অবস্থায় আছি তা সব চেয়ে বড় ও

সবাইয়ের কাম্য—এই বিশ্বাসের স্বপ্নজালে যদি নিজেকে না ভোলাতে পারবে তবে মানুষের বুদ্ধি আছে কিসের জন্য ?

ফ্র্যাঙ্ক সে আলোচনা শেষ করে বল্লে—সে যাই হোক, তুমি কলেজে ফিরে যাও, খরচের ভার আমার।

সুতরাং কলেজে আরও একটা সীমেষ্টার কোন মতে টেনে চল্লুম। যখন ছুটি হ'ল তখন সানফ্রানসিসকোতে গিয়ে কাজ নিলুম। এখানে খাওয়া-থাকা ও পঁচিশ ডলারের বদলে সারাদিন কাজ করতে হবে। ফ্রাঙ্কের ধার শোধ ও কলেজের জন্য টাকা জমাচ্ছি মনে করে ভারী একটা আনন্দ পেতুম।

শহরের একটি ছোট সিগার স্টোরে আমরা প্রায়ই সদল-বলে এসে জুটতুম। একদিন সারাদিনের কাজের শেষে আমি সেখানে গিয়ে দেখি বেশ ভিড় জমেছে আর সবাই খুব উদ্বিগ্নভাবে চুপি চুপি কথা কইছে। শুনলুম যে, খবর এসেছে যে এমা গোল্ডম্যান ও রাইটম্যান সান্‌-ডিগো শহরে গিয়েছিলেন ; সেখানকার লোকেরা তাঁদের গায়ে আলকাতরা আর পালক দিয়ে সাজিয়ে লাঞ্ছনা ও অপমানের একশেষ করেছে। নব্যতন্ত্রের দল ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—কি করা যায় !

যাই হোক, আমি আমার দলকে ভিড় থেকে খুঁজে বার করলুম, জেরী বল্লে—এ যুগে এইটাই সবচেয়ে চমৎকার খবর। কারণ এতদিনে এনার্কিষ্টরা জনসাধারণের নেকনজরে পড়েছে। আমাদের আন্দোলনের এর চেয়ে ভাল বিজ্ঞাপন আর কি হতে পারে ? কি সৌভাগ্য !

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—জেরী, এমনভাবে হোঁদল কুতকুত সাজা খুব বিশ্রী, না ?

জেরী বল্লে—তা জানি না, এনার্কিজমের প্রতি আমার ভক্তি কখনও অতদূর গড়ায় নি।

আমি বল্লুম—এখন আমরা কি করব ?

জেরী বল্লে—তাই তো, অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। একদিকে 'টাইমস বিল্ডিং' উড়িয়ে দেওয়া ও বহুলোকের প্রাণহানির অপরাধে ম্যাকনামারা ভাইদের লস-এঞ্জেলেস শহরে বিচার সুরু হয়েছে আর একদিকে এমা ও রাইটম্যান মহা বিপদে পড়েছে। লস-এঞ্জেলেস শহরের বুরজোয়াদের দিক থেকে ব্যাপারটাকে দেখলে মনে হয় যেন আলকাতরা প্রভৃতি মাখানো খুব সামান্য রকমেরই শাস্তি। কিন্তু এই সব বিপন্ন লাঞ্ছিত লোকগুলি আমাদেরই সহকর্ম্মী বন্ধু। তাই কি যে করব

তা বুঝতে পারছি না।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—জেরী, এখন সান-ডিগোয় গিয়ে বেচারী এমাকে তোমার সাহায্য করা উচিত। মেয়েদের সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করা অত্যন্ত ছোটলোকের কাজ।

জেরী বল্লে—ধরা পড়ে গেলে—সংস্কারের জাল আজও ছিঁড়তে পারলে না। এনার্কিষ্টরা কি কখনও স্ত্রী-পুরুষের ভেদ স্বীকার করে ? তাদের কাছে মেয়েও যেমন পুরুষ এনার্কিষ্টও সেই রকম ; কোন প্রভেদ নেই।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—বেশ কথা, তুমি তাদের সাহায্য করতে যাবে কিনা ?

জেরী বলে—হ্যাঁ, যাবো বৈকি।

পরের দিন জেরী বেরিয়ে পড়ল। যখন সে সান-ডিগোয় পৌঁছল তখন সেখানে গোল মিটে গিয়েছিল। তাই সে লস-এঞ্জেলসে চলে গেল। ম্যাকনামারা ভায়েদের যে আদালতে বিচার চলছিল সেখানে গিয়ে তার ভায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে ভদ্রলোক উকীল এবং ঐ মকদ্দমায় অন্য উকীলদের সঙ্গে তদ্বির করছিলেন। পরের দিন জেরীর কাছ থেকে এই চিঠিখানা পেলুম :—

"স্নেহের লিও, আমার ভাইকে পেয়েছি। অর্থাৎ সেই আমায় পেয়েছে। সে এখানকার উকীল। আমার আর এক ভাই যে জমি-জমার কাজ করে তার মত এটাও খুব বদমায়েস। আমায় আদালতে দেখতে পেয়েই সে সবাইকে জানালে যে আমি তার নিজের ভাই। আমি ভারী অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম, কারণ প্রায় ষোল বৎসর এর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তা ছাড়া যার সঙ্গে আদর্শের বা মতের কোন কিছু মিল নেই সে রকম কোন লোক ভাই বলে ডাকলে মনে মনে ভারী লজ্জিত হতে হয়। কিন্তু এই লজ্জা আর অসোয়াস্তি চরমে উঠল যখন সে আমায় জামা কাপড় আর জুতো কেনবার জন্য হাতে একশ ডলার গুঁজে দিলে। শিকাগোতে একটা পারিবারিক মিলন হবে, সে আমায় সেখানে নিয়ে যেতে চায়। আমার যদি খুব শীগ্‌গীর Stierner-এর 'Ego and His Own' ও Nietzsche-এর 'Beyond Good and Evil' বই দু'খানা পাঠিয়ে দাও তো বিশেষ উপকার হয়। বুরজোয়া ডালকুত্তা আমার পিছু লেগেছে, ভগবানের দোহাই আমায় বাঁচাও—বই পাঠিয়ো।"

লিও আর আমি চিঠিখানা আবার পড়লুম এবং খুব ভাবলুম যে কি করা যায়। লিও—বল্লে—আমাদের তো টাকা নেই, তার তবু কিছু আছে। তবে তাকে বই পাঠিয়ে কি হবে ? আমাদের ত মোটে দু'খানি বই আছে, আর সে দু'খানাই যদি তাকে পাঠিয়ে দিই তাহলে আমরা কোথায় যাই ! আর ভায়ের সঙ্গে যদি দেখা

হয়েই থাকে তো একটা পারিবারিক অভিজ্ঞতা লাভ হবে, তাতে আর হয়েছে কি ?

আমি বল্লুম—তার পরিবার তাকে গ্রাস করবে, তাদের আওতায় সে বুর্জোয়া বনে যাবে আর কি ?

লিও বল্লে—আরে, জেরী বছর পঁচিশ কোন কাজ করেনি, একবার তাকে শিকাগোতে টেনে নিয়ে গেলেই কি তার পঁচিশ বছরের নিষ্ক্রিয়তা নষ্ট করা সম্ভব হবে ? আমাদের মধ্যে জেরীই হচ্ছে সব চেয়ে দৃঢ়।

লিও ঠিকই বলেছিল। তিনদিনের মধ্যেই জেরীর আবির্ভাব হ'ল, তার পকেট টাকায় ভর্তি। সে বল্লে—যাক, এবার পাঁচ-ছ'মাসের মত একটা ভাল মাথা গোঁজবার স্থান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। আমি সবাইয়ের জন্য একটা ঘর ভাড়া নেব, যার যখন ঘুমুতে ইচ্ছা হবে সে গিয়ে সেখানে ঘুমোবে। আমরা তিনজন, আর দিনে চব্বিশ ঘণ্টা, কাজেই প্রত্যেকে আমরা আট ঘণ্টা করে ঘুমোতে পারবো। চল, এখনি একটা ঘর দেখা যাক।

আমায় ডেকে জেরী বল্লে—এবার তুমি কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাদের এখানে এস, যতদিন হাতে টাকা আছে ততদিন একসঙ্গে পড়া-শুনা করা যাবে। হাত যখন খালি হবে তখন আবার দল ভেঙ্গে যে যার পথ দেখবে।

সেই কথামত আমি বাড়ী গিয়ে মনিবকে জানালুম যে সপ্তাহ শেষে আমি চাকরি ছেড়ে দেবো। চাকরিতে জবাব পাবার আগে জীবনে এই প্রথম নিজে ইস্তফা দিলুম বলে মনে মনে খুব গর্বিত হয়ে উঠলুম।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা একত্র হয়ে আমরা নানা আলোচনা সুরু করলুম। এই প্রথম জেরী তার জীবনের গোপন কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করলে—সে বল্লে—আমাদের পরিবারে বাবা ছিলেন নিতান্ত অস্থির-মতি আর মা ছিলেন চিররুগ্ন। ভাই-বোনে আমরা ছিলুম ছ'জন। নানা দায়ে বাধ্য হয়ে আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে আমরা আমেরিকায় এসে উঠেছিলুম। নিউ ইয়র্কের এক ভাড়াটে ব্যারাকের একতলার ঘরে মা আমার মারা গেলেন। তখন আমার বয়স দশ হবে। দিনটা বৃথা নষ্ট হবে বলে আমরা কেউ স্কুলে যেতুম না, লোকের ফরমাস খেটে, খবরের কাগজ বিক্রি করে যা পেতুম তাতে আমাদের আর তিন বোনের কোন রকমে চলে যেত। এদিকে বাবা কখনও কাজ পেতেন, কখনও বা কিছু পেতেন না। অথচ মনের ঝাল মেটাবার জন্য আমাদের ধরে ধরে মারতেন। একদিন এক বোনের অসুখ হ'ল। আমাদের সবায়ের হাত কুড়িয়ে দেখি যে মোটে আটাশ সেণ্ট আছে। ভাড়াও দিতে হবে। আমরা সবাই আশা করলুম আর ঈশ্বরের কাছে

প্রার্থনাও করলুম যে বাবা যেন আজ রাত্রে দশ ডলার নিয়ে বাড়ী ফেরেন।

রাত ন'টার সময় বাবা বাড়ী ফিরলেন, গায়ে-মুখে তাঁর হুইস্কির গন্ধ ভর ভর করছে। তিনি পুরো মাতাল হয়ে এসেছিলেন। আমরা যে টাকা তাঁর কাছে আশা করছিলুম, তা চাইতে লাগলুম। আমাদের বার বার চাওয়াতে তিনি হঠাৎ রেগে উঠে, পাগলের মত ছুটে গিয়ে খামকা বড় ভাইকে মারতে লাগলেন, তারপর মেজো ভাইয়ের উপরে গিয়ে পড়লেন। মারতে মারতে তাঁর যেন খুন চেপে গেল এবং তিনি অসুস্থ বোনটিকে মারতে লাগলেন। এই পাশবিক ব্যাপার দেখে আমি মর্ম্মান্তিক ভয় পেয়েছিলুম, কিন্তু আর সহ্য করতে না পেরে, মরিয়া হয়ে হঠাৎ আমি তাঁকে আক্রমণ করলুম। আমার সর্ব্বাঙ্গে তাঁর ঘুঁসি চড় পড়ছিল, কিন্তু আমি প্রাণপণে তাঁকে আঁকড়ে তাঁর গলা কামড়ে ধরেছিলুম। আমার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তিনি বারবার আমায় মারছিলেন, কিন্তু আমি দাঁত দিয়ে ডালকুত্তার মত কামড়ে ছিলুম—কোনমতেই ছাড়ছিলুম না। ছাড়তে আমার ভয় হচ্ছিল, কারণ আমি জানতুম একবার ছাড়া পেলে সে-দণ্ডে আমার আর নিস্তার থাকবে না। তারপর হঠাৎ মুখে একটা অদ্ভুত স্বাদ লাগল। বাবা খুব কাতরভাবে গোঙাতে লাগলেন। মুখে আমার রক্ত লেগেছিল—আমার মুখ থেকে মন পর্য্যন্ত সব তিতো হয়ে গেল—বাবার হাতে শাস্তির ভয় না মেনে আমি তাঁকে ছেড়ে দিলুম। বাবা একটু পিছন দিকে হঠে টাল খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি তাঁর দ্বিতীয় আক্রমণের অপেক্ষায় রইলুম। কিন্তু তিনি যখন মাটিতে পড়েও গোঙাতে লাগলেন তখন মন আমার ব্যথায় ভরে গেল। আমার সব ভাই-বোনকে ভয়ানক ভয় পেয়ে ঘরের কোণে চুপ করে জড়সড় হয়ে থাকতে দেখে মন বিরস হয়ে গেল ; নিজের উপর একটা ধিক্কার জেগে উঠল।

রাতের অন্ধকারে আমি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে রাত-ভোর সারা নিউ ইয়র্ক শহর ঘুরে ভোরের বেলা বাড়ী ফিরলুম। ভাই-বোনেরা সবাই অকাতরে ঘুমোচ্ছিল, বাবার বিছানাটা শুধু খালি পড়েছিল। তাঁকে বাড়ীর মধ্যে কোথাও দেখতে না পেয়ে আমি চারিদিকে খুঁজলুম। সেই গোলমালে আমার অন্য ভাই-বোন ও রুগ্না বোনটিও জেগে উঠল। তারা বল্লে যে আমি বাড়ী ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবাও বেরিয়ে গেছেন। তাঁর আর কোন খবর তারা জানে না। তিনি যে কোথায় চলে গেছেন তা আজ পর্য্যন্ত কেউই জানে না।

এমনি করে তাঁর উধাও হবার পর থেকে সংসারের সব ভার পড়ল আমাদের তিন ভায়ের উপর। দু'টি বছর ধরে আমরা প্রাণপণে বেশ ভাল করেই সংসার

চালিয়েছিলুম।

সাগ্রহে লিও বল্লে—তারপর কি হ'ল ?

জেরী বল্লে—যা হ'ল তাতে আমার ভবিষ্যৎ ঠিক হয়ে গেল। একদিন কাজের শেষে বাড়ী ফেরবার পথে দেখলুম একদল লোক সার বেঁধে চলেছে। তাদের দেখে ভারী গরীব বলে মনে হ'ল ; তারা সব বেকার। তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে তারা চলছিল। বাড়ী গিয়ে ভায়েদের একথা বলতে, তারা ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিলে, বল্লে "তারা যদি কাজ না পেয়ে থাকে তবে সে তাদের নিজেদের দোষে। গোল কি হচ্ছে জান, লোকগুলো কাজ করতে চায় না, কাজেই বেকার বসে আছে।" বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে আমি পার্কের দিকে চলে গেলুম, সেখানে যেতে প্রায় সওয়া এক ঘণ্টা লেগেছিল। তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল আর আমিও ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছিলুম। দেখলুম মেয়ে-পুরুষ সব অন্য লোকের বাড়ীর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, বৃষ্টিতে তাদের জামা-কাপড় ভিজে গেছে আর খিদেয় তাদের চোখগুলো যেন সবুজ হয়ে জলছে। জীবনে সেদিন প্রথম বুঝলুম যে ক্ষুধা হচ্ছে একটা সার্ব্বজনীন ব্যাপার। এই ক্ষুধার মধ্যে দিয়ে মানুষ যেমন অনেক সত্যের সন্ধান পায়, অন্য কিছুতে ততটা হওয়া সম্ভব নয়। সেদিন যখন বাড়ী ফিরলুম তখন প্রায় মাঝ রাত্রি। ভিজে কাপড়-জামা টাঙ্গিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম। পরের দিন আমি আর কাজে গেলুম না।

এবার আমার ভায়েদের কথা কিছু বলি, সংসার পালনের জন্য তারা ত প্রাণপণে পরিশ্রম করতই, আবার নাইট স্কুলেও যেত এবং সর্ব্ব রকমে নিজেদের উন্নতিরও চেষ্টা করত। একজন আইন পড়ে উকীল হবার চেষ্টা করছিল, আর একজন কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে ব্যবসা সম্বন্ধে পড়তে সুরু করেছিল। সবায়ের ভালভাবে খাওয়া পরার মত অর্থের অভাব নেই এবং ভায়েরা নিয়মিত কাজ করছে দেখে আমি কাজে যাওয়া বন্ধ করলুম। সব জিনিসের উপর আমার একটা অপরিসীম বিরক্তি এসেছিল এবং ক্রমে মনের মধ্যে এমন একটা শূন্যতা জমে উঠল যা আমি কোন মতেই দমন করতে পারলুম না। খালি বাড়ীতে আমি একা বসে থাকতুম, বোনেরা স্কুল ও ভায়েরা কাজ থেকে ফিরে এলে তাদের খাবার ধরে দিতুম। কেন যে আমি কাজে যাইনি একথা বল্লেও তারা কিছুতে তা বুঝত না। মনের শূন্যতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। আবার রাত্রে পথে পথে বেড়িয়ে বেকার লোকগুলোকে দেখলুম, রাত্রে তারা যে যেখানে পেয়েছে আশ্রয় নিয়েছে। সারা রাত আমি পথে পথে ঘুরলুম, পরে যখন সকাল হ'ল আমি আর বাড়ী ফিরতে

পারলুম না।

এইবার আমার ভবঘুরে জীবনের সুরু হ'ল। নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে আমি দেশের জিনিসপত্র কেমন করে বাড়ছে আর দেশের টাকা কেমন করে নানা হাতে ছড়িয়ে পড়ছে সে সম্বন্ধে নানা রকমের গল্প শুনতুম। কিন্তু এমার্সন বলে একটি লোকের Conduct of Life বইখানা যেমন করে আমার সমস্ত মনকে অভিভূত করেছিল তেমন আর কিছুতে নয়। অদ্ভুত লোক এই এমার্সন! অন্তর্যুদ্ধে সময় তিনি বেঁচে ছিলেন অথচ তাঁর রোজ-নামচায় সে সম্বন্ধে খুব সামান্য মাত্র উল্লেখ আছে। জীবনে এই প্রথম একজনের পরিচয় পেলুম যিনি যুদ্ধের মধ্যে থেকেও তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছেন। আমি এঁর সমস্ত রচনা পড়ে ফেল্লুম। আজ শুধু তাঁর একটি কথা মনে আছে, কোন এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "মানুষকে এককভাবে, স্বতন্ত্রভাবে, ব্যক্তি হিসাবে বিচার করা চাই।" তিনিই আমাকে স্বাতন্ত্র্যবাদী করে গড়ে তুলেছেন।

বছর খানেকের মধ্যেই বোধ হয় আমি শিকাগো গেলুম। হেমার্কেটের কর্ম্মিক শোভাযাত্রায় যখন বোমা ফেটেছিল, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলুম। মহাজনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কর্ম্মিকের সেই সর্ব্বপ্রথম প্রতিঘাত! তারপর শিকাগো থেকে নিউ ইয়র্কে পায়ে হেঁটে চলে এলুম। এই সময়টা আমি এমার্সনের বইগুলি শেষ করেছিলুম। আবার বাড়ী ফিরে এলুম। একটা কারখানায় কাজ করতুম আর লাইব্রেরীতে পড়তুম। কিন্তু একটা জিনিস আমার মনের মধ্যে ঢুকে সব গোলমাল করে দিলে। আমার বোন দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হলেও আজ সে এমন একটি ছেলেকে ভালবাসে যে তাকে খুব দামী দামী জিনিস উপহার দেয়—আমার গরীব ভায়েরা আজ নানা অর্থকরী কাজে লেগে গিয়ে দিনে দিনে বড়লোক হচ্ছে, আর আমি আজও কারখানায় মজুর রয়ে গেছি।

অকস্মাৎ এই সত্য উপলব্ধি করলুম যে মানুষের স্বভাবের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন হাত নেই। যে অবস্থার মধ্যে আমি বেড়ে উঠেছি আমার অন্য ভাই-বোনও ঠিক সেই অবস্থার মধ্যে মানুষ হয়েছে, কিন্তু তারা সবাই ধন-সম্পদের পিছনে ছুটেছে আর আমি এই বিশ্বের অর্থ ও প্রকৃতি নিয়ে ভেবে মরছি। আমি বেশ বুঝলুম যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দিয়ে মানুষকে বিচার করা যায় না, তাকে জানতে হলে ব্যক্তিগত চরিত্রের হিসাব করতে হয়। বাহ্যবস্তুর প্রভাবে মানুষ গড়ে উঠে না, তার অন্তর প্রকৃতিই তাকে গড়ে তোলে—এই কথাটাই আমার কাছে ধ্রুব সত্য বলে প্রতিভাত হ'ল। কার কাছে এ কথাটা শিখেছিলুম—এমার্সন না

জীবন, কি জানি ?

নিজের বাল্যকাহিনী শেষ হতেই জেরী অধীরভাবে উঠে পড়ে বল্লে—চল, চল, এবার বেরিয়ে পড়ে একটা ঘর ঠিক করে আসা যাক্।

খানিকক্ষণ খোজাখুঁজির পর একটি বাড়ীওয়ালীর দেখা পাওয়া গেল। আমরা মাস ছয়েকের জন্যে একটা ঘর ভাড়া করলুম! বাড়ীওয়ালী মহিলাটি বেশ মজার। জেরী তাকে জিজ্ঞেস করলে—এক বিছানায় যদি তিনজন লোক ঘুমোয় তাতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি ?

বাড়ীওয়ালী বল্লে—কি বলছেন মশায় ?

জেরী আবার বল্লে—এক বিছানায় তিনজনে ঘুমোতে পারে তো ?

বাড়ীওয়ালী বল্লে—আজ্ঞে, তিনজন মানে স্বামী-স্ত্রী আর ছোট ছেলে তো ?

জেরী বল্লে—না, না, আমি বলছি কি, একজন প্রথম আটঘণ্টা ঘুমোবে, আর একজন দ্বিতীয় আটঘণ্টা ঘুমোবে, আর একজন ঘুমোবে বাকি সময়টা। তারা একই বিছানায় ঘুমোবে তো! পর পর তিনজন যদি একই বিছানায় শোয় তাতে তোমার আপত্তি আছে কি ?

এবার বাড়ীওয়ালী আমাদের মতলব বুঝতে পেরে বল্লে—আমার ভাড়া পেলেই হ'ল, বিছানায় যার খুশী সে শুতে পারে, আমার তাতে কি ?

জেরী তখন পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে তাকে দিয়ে বল্লে—এই তিন মাসের ভাড়া রইল, এতে হবে তো ?

টাকা গুনতে গুনতে সে শুধু ঘাড় নাড়লে।

মাথা গোঁজবার স্থানটুকু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা পার্কে গেলুম। আমাদের এত দিনের আশ্রয় সেই বেঞ্চ দু'খানায় বসে কথা সুরু করলুম। আমাদের এই ভাগের বিছানায় কে যে প্রথম শোবে তাই নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে লাগলুম। অনেক তর্কের পরে শেষে ঠিক হ'ল যে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখা যাক্। প্রথম আটঘণ্টা পড়ল লিওর ভাগ্যে, দ্বিতীয়ভাগ আমার বা ফ্রাঙ্কের এবং সব শেষ জেরীর।

জেরীর কিন্তু এ বন্দোবস্ত মনঃপুত হোল না। সে বল্লে—বাঃ এ ত একটা পুরোদস্তুর বুরজোয়া বন্দোবস্ত গড়ে উঠল দেখছি, একেবারে আইন-কানুন-বাধ্য ব্যাপার। আমি এসব মেনে চলব না। ঘর ভাড়া করেছি বলে কি স্বাধীনতা হারাতে হবে নাকি ? যার যখন ইচ্ছে হবে সে তখন ঘুমোবে, ব্যস্।

তারপর রেস্তোরাঁয় গিয়ে গিয়ে সবাই কিছু খেয়ে নিলুম। আমি সে রাত্রে

আমার কাজের জায়গায় ফিরে গেলুম। তারপর দিনকয়েক আর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়নি। বোধ হয় চতুর্থ দিন রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার উপক্রম করছি এমন সময় আমার একতলা ঘরের জানলার কাঁচে কে যেন আঁচড়াচ্ছে বলে মনে হ'ল। প্রথমটা খুব ভয় পেয়েছিলুম, কিন্তু একটু পরেই বুঝলুম যে বন্ধুদের কেউ হবে। তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখি লিও দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভিতরে ডেকে আনলুম।

সে বল্লে—তোমার কাছে আজ আমায় শুতে দেবে ?

আমি বল্লুম—কেন, কি হয়েছে ?

সে বল্লে—এখন ফ্র্যাঙ্কের শোবার পালা, অথচ তার সময় না হলেও জেরীও দেখি এসে জুটেছে। আমি আর কি করি ? তিনজনের ত আর সেখানে জায়গা হতে পারে না, তাই তোমার কাছে চলে এলুম। কি বল, তাহলে শুয়ে পড়ি ?

পররাত্রে ফ্র্যাঙ্ককে আমার কাছে পাঠিয়ে লিও ও জেরী সেই ভাড়াটে ঘরে রইল। কিছুক্ষণ বিছানায় শোবার পর ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—আরে কি কামড়াচ্ছে বল ত ? লিও ছাড়া তোমার বিছানায় আর কেউ এসেছিলো নাকি ?

আমি বল্লুম—না তো !

কিছু পরে সে বল্লে—আমি কি ভাবছি জানো ? আমার মনে হয় ভাড়াটে ঘরটা উকুন প্রভৃতিতে ভর্ত্তি। লিও অনেক কিছু সঙ্গে করে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেছে, আর আমিও বোধ হয় কতকগুলো সেখান থেকে আমদানি করেছি। যাই হোক, যদি এতকাল ধরে মহাজনী ব্যবস্থা সহ্য করতে পেরে থাকি তো একরাত্রি উকুনের কামড় সহ্য করা কঠিন হবে না।

সুতরাং সারারাত বারে বারে খানিক ঘুমিয়ে ও খানিক গা চুলকে কোন রকমে কাটানো গেল।

ভোরে উঠেই ফ্র্যাঙ্ক বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে দিয়ে সেই শকুনি বুড়ীকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেবার মতলবে। সে খিড়কীর দরজা পার হতে না হতেই দেখি লিওকে সঙ্গে করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসছে।

লিও বল্লে—সর্ব্বনাশ হয়েছে। জেরী গ্রেফতার হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—গ্রেফতার হ'ল কেন ?

সে বল্লে—চুরি করেছে বলে। কাল রাত দশটার সময় জেরী যখন বাড়ী ফিরছিল সে কাছে কোথায় বন্দুকেরআওয়াজ শুনতে পেলো আর কিছু পরেই একটা লোক ছুটে তার পাশ দিয়ে গেল। দুটো পাহারাওয়ালা সেইসঙ্গে ছুটতে ছুটতে

এসে জেরীকে পাকড়ালে ; তারা বল্লে যে, এই লোকটাই এইমাত্র একটা দোকান লুট করে এসেছে। তার সঙ্গে দেখা করবার ও জামিন হবার জন্য আজ সকালে থানা থেকে জেরী আমায় টেলিফোন করেছে।

ফ্র্যাঙ্ক খুব শান্তভাবে বল্লে—যাক্, জেরী যখন একরাত থানায় কাটিয়েছে তখন সে জায়গাটা এবার ছারপোকা-উকুনে ভরল দেখছি, বেচারা চোরগুলো এতদিন অন্ততঃ ঘুমিয়ে বাঁচত, এখন থেকে তার শেষ হ'ল।

লিও বল্লে—কিন্তু এ সম্বন্ধে কি করা যায় ?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—কিছুই কোরো না।

আমি বিস্মিত হয়ে বল্লুম—কিছু না ?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—না, এই প্রথম ? জেরী জীবনে বহুবার পুলিশের হাতে পড়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তারা ওকে সাজা দিতে পারেনি। পরের জিনিস হাত করা ওর ধাতে নেই একথা জানলে, তারা আর কেমন করে তাকে সাজা দেবে বল ?

কথাটা আমার মনঃপুত হ'ল না ; আমি বল্লুম—কিন্তু বিচার সুরু না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে জেলে পচতে হবে তো ?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—আরে না, তার আগেই ওকে ছেড়ে দেবে। পুলিশগুলো একেবারে গর্দ্দভ। জেরীর বদলে আর একটা ভাল লোককে চোর বলে চালিয়ে দেবে। 'হেবো' আর বদমায়েসের মধ্যে তফাৎটা তারা না জানলেও, জেরীকে বেশীক্ষণ আটকে রাখবে না।

আমি আপত্তি তুল্লুম—তাকে জেলে পাঠাতে পারে তো।

ফ্র্যাঙ্ক বলে উঠল—ঘোড়ার ডিম ! তারা ও-সব কিছুই করবে না—ছেড়ে দেবে আর আমাদেরই ওকে পুষতে হবে।

উপরে নড়াচড়ার শব্দে বাড়ীর সবাই জেগে উঠছে বুঝে ও আমার কাজ সুরু করবার সময় হ'ল দেখে আমি ফ্র্যাঙ্ক ও লিওকে চলে যেতে অনুরোধ করলুম।

লিও বল্লে—বেশ, আমি কিন্তু থানায় যাচ্ছি—দেখি কি করতে পারা যায়।

সারাদিন কাজের মধ্যে খুব উত্তেজনায় সময় কাটল। টেলিফোন করে বা আমাদের ভাড়াটে ঘরে গিয়ে কোথাও বন্ধুদের কোন সন্ধান পেলুম না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে রাতে যখন ঘরে বসে বই পড়ছি এমন সময় শার্শির উপরে সেই আঁচড়ের শব্দ পেলুম এবং জেরী ঘরে এসে ঢুকল।

আমি বল্লুম—বাঃ, আমি ভাবছি তুমি এখনও জেলে—তারা জামিন নিয়ে

তোমায় ছেড়ে দিলে বুঝি ?

জেরী বল্লে—উঁহু, তারা অমনি ছেড়ে দিলে।

—ফ্র্যাঙ্ক আর লিও জানে তো ?

—কি জানি, সকাল থেকে তো তাদের দেখিনি।

আমি বল্লুম—সে কি ! তারা যে তোমায় জামিনে ছাড়িয়ে আনবে বলে বেরিয়ে গেল।

সে বল্লে—হবে, তারা বোধ হয় এখনও জামিনের চেষ্টায় ঘুরে মরছে। এদিকে পুলিশ আসল চোরকে খুঁজে পেয়েছে, কাজেই নকলটিকে আর তাদের দরকার না হওয়ায় ছেড়ে দিল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার সঙ্গে তারা খুব খারাপ ব্যবহার করে নি ত ?

জেরী বল্লে—হুঁ, তুমি ত জানো, রাষ্ট্র চিরকালই একটা মূর্খের কারখানা, যখনই সে তোমার ওপর হাত দেয় তখনই তোমার অনেকটা ক্ষতি করে। বুঝলে, যতদিন না এই রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করছ ততদিন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন স্থান হবে না। দুটো আকাট লোক একটা বিশেষ রকমের উর্দ্দি এঁটে নিজেদের সর্বশক্তিমান ভগবান মনে করে রাস্তার যে-কোন লোকের সঙ্গে যা তা ব্যবহার করতে পারে, একথা ভাবলে খুব অবাক মনে হয় না কি ? অথচ—না, রাষ্ট্রের উচ্ছেদ অনিবার্য্য ; পৃথিবীতে শান্তি ও স্বাধীনতার আশা যদি রাখ তবে সেই সঙ্গে বর্তমান চার্চকেও সমূলে লোপ করতে হবে।

আমি বল্লুম—আচ্ছা, তারা দুজনে কোথায় গেছে বলে তোমার মনে হয় ?

সে বল্লে—জানিও না, জানতে চাইও না। হয়ত আমাদের ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। আচ্ছা চল, একবার গিয়েই দেখি হয়ত দুই ভূতে আমার জামিন হবার মত লোকের খোঁজে সারা শহর ঢুঁড়ে মরছে।

দু'জনে পথে বেরিয়ে ফিলমোর স্ট্রীটের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে দেখি রাস্তার দুই মোড়ে দুই মূর্তি লোক জমিয়ে জোর বক্তৃতা দিচ্ছে। লিওর কথা শুনতে পেলুম—যতদিন না রাষ্ট্রের উচ্ছেদ সাধন করবে ততদিন স্বাধীনতা পাবার কোন আশা নেই। দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হচ্ছে চরম শক্তি, অপ্রতিহত প্রভু-শক্তি। এ প্রভুত্ব যতক্ষণ যে দেশে অব্যাহত থাকবে সে দেশে ততদিন স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই। অতএব, হে ভদ্রমহিলা ও পুরুষগণ, আসুন আমরা মানুষের এই পরম শত্রুর চরম নিপাতের ব্যবস্থা করি।

রাস্তার অপর মোড়ে উল্টান টবের উপর দাঁড়িয়ে ফ্র্যাঙ্ক বলছিল—ভদ্রমহিলা ও পুরুষগণ, আমি আপনাদের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছি যে আমাদের এ জীবনে গৌরবের কিছু নেই এবং চার্চ আর স্টেটের (ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র) দুই জাঁতা-কলের মাঝখানে বেঁচে থাকার মত এত বড় লাঞ্ছনারও আর তুলনা নেই। এ জাঁতা-কলে আমরা শুধু যে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছি তা নয়, সত্য-সত্যই লোপ পেতে বসেছি। আমি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি, কিন্তু দুধ দেবার সময় গরুর যতটুকু ব্যক্তিত্ব থাকে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য তার চেয়ে কিছু বেশী নয়, অথচ গরুর যেটুকু বুদ্ধি আছে সেটুকুও যদি আপনাদের থাকত তবে আজ আপনাদের এ দুর্দশা হ'ত না।

শ্রোতারা খুব স্ফূর্তিতে তার প্রশংসা করতে লাগল।

ভিড়ের মধ্যে জেরী ও আমাকে দেখতে পেয়ে ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—এবার আমি থামব এবং আমার হিন্দু বন্ধু টুপি নিয়ে আপনাদের কাছে যাবেন।

কাজেই আমি টুপি নিয়ে গেলুম ও প্রায় দু'ডলার পাওয়া গেল।

জেরীকে দেখে ফ্র্যাঙ্ক খুব খুশী হ'ল; বক্তৃতার শেষে লিও-ও এসে জুটল। জেরী তার জেলের অভিজ্ঞতা বলতে সুরু করলে—

প্রথমবার আমি জেলে যাই শিকাগো শহরে। এক দল মজুরের সঙ্গে আমায় গ্রেপ্তার কোরে নিয়ে জেলে পুরেছিল। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কিছুই না পেয়ে ছেড়ে দেয়। সেই এক মাস জেলে বসে আমি অনেক কথা ভাবতে পেরেছিলুম। যখন ব্যস্ত থাকি তখন তো আর বেশী ভাববার সময় থাকে না, কিন্তু জেলের মধ্যে বন্দীরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় ও আড়ালে ফিস ফিস করে আমায় তাদের জীবনের অনেক কথা বলেছিল। তখনই আমি ভাল করে বুঝেছিলুম যে, আকাশ-ঘেরা পৃথিবীতে বাস করা যেমন সহজ, জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে বাস করবার অভ্যাসও তেমন কঠিন নয়। জেলে মানুষকে অপরাধী করে না তুল্লেও আস্ত জানোয়ার বানিয়ে তোলে নিশ্চয়ই। অবশ্য জানোয়ারের সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করবার তো কোন কারণ দেখি না। জানোয়ার হওয়া মন্দ কি বল? কিন্তু যা বল, জীবনে যাই ঘটুক, তা মেনে নিয়ে জানোয়ারের মত শান্তভাবে অবস্থার পরিবর্ত্তন করা আমাদের পোষায় না। সে এক দুর্ভাগ্য।

দ্বিতীয়বার আমি জেলে যাই কু-মতলবে বালিকা-হরণের অপরাধে। রাত্রে একটি মেয়েকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে দেখে, তারই খোঁজে একটা বেশ্যাবাড়ীতে

গিয়েছিলুম। সে মেয়েটির কথা শুনে তাকে আমার বাড়ীতে এনে, আমি তার খাবার ও শোবার ব্যবস্থা করে দিলুম; কিন্তু যে স্ত্রীলোকটা তাকে ভুলিয়ে এনেছিল সে এসে তাকে নিয়ে যাবার জন্য জবরদস্তি করতে লাগল। আমি তাকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলুম।

এক সপ্তাহের মধ্যেই মেয়ে ভুলিয়ে এনে বিক্রি করবার অপরাধে পুলিশ আমায় গ্রেফতার করলে এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব হ'ল না। তারা বল্লে যে আমিই প্রথমে মেয়েটিকে ভুলিয়ে এনে কু-মতলবে বিক্রি করি। তারপর আবার নতুন করে অন্য লোকের কাছে বিক্রি করব বলে কুটনীর বাড়ী থেকে তাকে চুরি করে এনেছি। তারা আমায় হাতে হাতে ধরে ফেলেছে, দূরে এক জায়গায় আমি নাকি মেয়েটিকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়বার চেষ্টায় ছিলুম। এ কথার তারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলে বিস্তর।

ব্যাপার ত বিলক্ষণ ঘনিয়ে উঠল এবং আমি বেশ বুঝলুম যে নির্দোষ হলেও এবার আমার পরিত্রাণ নেই। তোমাদের একটা সাদা কথা বলি—তুমি যতই নির্দোষ আর শিষ্টশান্ত হও, পৃথিবীর বদমায়েসদের কু-মতলবের হাত থেকে তোমার মুক্তি নেই। সাপ যেমন সহজে মুখ থেকে বিষ বার করে এরাও তেমনি মানুষের ক্ষতি করে।

যাই হোক, ক্রমে বিচার শুরু হ'ল। জুরী বাছাই হ'ল; তিনজন ধনী ব্যবসাদার, একজন পাদরী আর বাকীগুলো সব অন্য কাজ করে। আমার অপরাধ প্রমাণ ব্যাপারটা খুব সহজেই হয়ে গেল। আমায় দু'জন লোক সনাক্ত করলে—একজন রেলের গার্ড আর একজন বেশ্যাবাড়ীর নিগ্রো দরোয়ান। তারা দু'জনেই সাক্ষী দিলে যে আমি মেয়েটিকে এনেছিলুম এবং আমিই আবার তাকে সরিয়েছি।

ব্যাপারটি তো বেশ জমাট হয়ে উঠল। অপর পক্ষের প্রমাণের মধ্যে কোথাও একটু ফাঁক দেখতে পেলুম না। লাল কাপড় দেখে ষাঁড় যেমন রাগে অন্ধ হয়ে চেঁচায়, ডিষ্ট্রিক এটর্ণী তেমনি হুঙ্কার ছাড়তে লাগল। মনে করলুম জুরী তাকে থামিয়ে দেবে, কিন্তু তারা দেখলুম বারোটা শকুনির মত হাঁ করে চেয়ে আছে, তাদের লক্ষ্য শুধু মড়াটা কোন দিকে পড়ে। জজটি যেন বুড়ো ধাঙড়, মৃত্যু ও মৃতের সম্বন্ধে তার অগাধ ঔদাসীন্য। মড়া-ঘাঁটা যেন তার কর্ত্তব্যের অঙ্গ তাই সে মুখ গোমড়া করে বসেছিল। সমস্ত ঘটনাটা যেন একটা বিরাট অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মত গম্ভীর হয়ে উঠেছিল এবং সে অভিনয়ে আধারশায়ী মৃতের ভূমিকায় ছিলুম আমি। আইনের সেই পুঞ্জীভূত ধর্ম্মাচার, যেন পূতবারির মত আমার উপর ক্রমাগত

পড়ছিল। সত্যি বলছি, যদি কোনদিন কবরে যাবার বাসনা থাকে তবে সেদিন আদালতে যেও—অন্য কোথাও অধর্মাচার এমন সজীব নয়।

যাই হোক, আমি একটা মতলব ঠাউরে ছিলুম। আমি দেখলুম যে যদি কোন রকমে এ প্রমাণের জাল কাটা যায় তবে সে ঐ নিগ্রোর কথার ফাঁক ধরেই পারা যাবে। আমি আদালতকে জানালুম যে নিগ্রোকে আমি জেরা করতে চাই। ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী একটু হেসে, নিগ্রোকে সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়াবার ইশারা করলেন ও আমি জেরা শুরু করলুম।

—আমায় তুমি কবে আসতে দেখেছিলে?

নিগ্রো বল্লে—গত অক্টোবর মাসে।

—তা জানি না মশায়, তবে সেদিনটা ছিল শুক্রবার।

—আমি কি পোশাক পরেছিলুম?

—সে কথাটা ঠিক মনে নেই মশায়।

—আমায় কি রকম দেখাচ্ছিল?

নিগ্রো বল্লে—আজ্ঞে ভদ্রলোকের মত।

—ভদ্রলোক দেখলে তুমি চিনতে পারো?

ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী বল্লেন—এ প্রশ্নে আমার আপত্তি আছে।

জজ বল্লেন—আপনার আপত্তি বজায় রইল।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম—যখন এসেছিলুম তখন আমার হাতে কি ছিল তা তোমার মনে আছে?

—আজ্ঞে না।

—কেমন করে আমি বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিলুম তা মনে আছে কি?

—আজ্ঞে আপনি ভোঁদড়ের মতন চুপিসাড়ে ঢুকেছিলেন।

—আমার গায়ে কি ভোঁদড়ের মতন গন্ধ ছিল?

ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী বল্লেন—এ প্রশ্নে আমি আপত্তি করছি।

আদালত বল্লেন—আপত্তি বহাল হ'ল।

—আমি বাড়ীতে আসবার পর কি হ'ল?

—আজ্ঞে কিছুই না।

—তোমার ঠিক মনে আছে আমি একা ঢুকেছিলুম?

নিগ্রো বল্লে—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভদ্রলোক না হলেই তো তার সঙ্গে কেউ থাকে না। কত কত ভদ্রলোক রোজই যাওয়া-আসা করে, কিন্তু কারুকে তো একা

আসতে দেখি না।

—তাহলে তুমি ঠিক জানো যে আমার সঙ্গে কেউ ছিল না?

—আজ্ঞে না।

—ঠিক তো, আমার সঙ্গে মেয়ে-পুরুষ কেউ ছিল না?

—আজ্ঞে না।

—কিন্তু তুমি আগে সাক্ষী দিয়েছ যে এই মেয়েটি আমার সঙ্গে ছিল।

—আজ্ঞে তা বলেছি বটে।

—তাহলে তোমার কোন্ কথাটা ঠিক? আমি একা এসেছিলুম না এই মেয়েটি আমার সঙ্গে ছিল?

—আজ্ঞে আমি কিছু জানি না—আপনি সব ঘুলিয়ে দিয়েছেন।

—আমি যে এই মেয়েটিকে নিয়ে তোমাদের বাড়ীতে গেছি এ মিথ্যে কথা তোমায় কে শেখালে বল ত?

নিগ্রো যখন সে-কথা বলবার উপক্রম করছে তখন ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী তাড়াতাড়ি উঠে আপত্তি তুললেন, কিন্তু আদালত সে আপত্তি গ্রাহ্য করলে না।

আমি তখন বল্লুম—হুজুর, আমি একে আর বেশী জেরা করতে চাই না; এ নিগ্রোটা মন ঠিক করে কথা বলতে পারছে না, তাই আমার তো খুব বিশ্বাস যে ওকে কেউ এসব কথা শিখিয়েছে।

তারপর রেলের গার্ডকে জেরা করতে আরম্ভ করলুম। সমস্ত জেরায় সে তার আগেকার কথাই বজায় রাখলে। কোন্‌খানে আমি মেয়েটিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠেছিলুম আর লা সাল স্ট্রীট বা এঙ্গেলউড কোন স্টেশনে নামলুম, এ দুটো কথা সে বলতে পারলে না।

ব্যাপারটা আরও তলিয়ে দেখবার জন্য আরও গোটা দুই সাক্ষীকে জেরা করবার মতলব ছিল। কিন্তু দেখলুম তার কোনই দরকার নেই। নিগ্রোটাকে আবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বল্লুম—সে হাল ছেড়ে কাঁদতে লাগল।—সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বল্লে—আজ্ঞে দয়া করে আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি কিছুই করিনি। আজ্ঞে, ঐ সাহেবরা আমার মাথায় এই সব কথা ঢুকিয়ে দিলে।

কাজেই জুরী নিরপরাধ বলে আমায় ছেড়ে দিলে।

লিও বল্লে—আর সে মেয়েটির কি হ'ল?

জেরী বল্লে—সে এক বিচিত্র জীবন—তখন তো আমি তাকে আমার কাছে

এনে রাখলুম এবং যথাসম্ভব ভদ্র করে তুললুম। তাকে লিখতে পড়তে অর্থাৎ সত্যিকার পড়াশুনা শেখালুম। তারপর মদের দোকানে কাজ নিয়ে দু'বছর ধরে যা পেয়েছি তাতে তাকে ব্যবসা-সম্বন্ধে স্কুলে পড়িয়েছি।

আমি বল্লুম—ছিঃ ছিঃ, কি নোংরা কাজ—এমনি করে, মানুষের সর্ব্বনাশ করা ভারী বিশ্রী—তুমি মদ বিক্রি করেছ?

জেরী বল্লে—মদে যেমন মানুষের মন মাটি করে, তোমার আইডিয়াতেও যে লোকের সে সর্ব্বনাশ হয় না তা তুমি কেমন করে জানলে? তফাৎ হচ্ছে যে একটাকে তুমি আইডিয়া বলছ আর অন্যটাকে বলছ নেশা—এই তো!

লিও আবার জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু তারপর সে মেয়েটার কি হ'ল?

জেরী বল্লে—হাঁ, তারপর সে এক উকীলের কেরানী হ'ল। তারপর নিত্য যা ঘটে থাকে তাই হ'ল। উকীলটা তার সঙ্গে ভালবাসায় পড়ে স্ত্রীকে ডাইভোর্স করে তাকে বিয়ে করে বসল। মেয়েটির বিরাট ও মহান্ ভবিষ্যৎ জীবনের এমন একটা অধম পরিণতি ঘটল। ব্যাপার হচ্ছে যে মেয়েরা মহত্ত্বকে ভয় পায়, তার চেয়ে বিয়ের আশ্রয়ে তারা নিজেদের অনেক বেশী নিরাপদ মনে করে। কেন যে করে তা অবশ্য আমি জানি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—মেয়েদের সম্বন্ধে তুমি কি জানো?

জেরী বল্লে—খুব সামান্যই। অবশ্য এককালে আমি কয়েকজন বিখ্যাত মহিলাকে জানবার সুযোগ পেয়েছি, যেমন ধর লুইসি মিচেল, ইংলণ্ডের মিসেস অ্যাডামস প্রভৃতি। অ্যানি বেস্যাণ্টের বক্তৃতাও আমি শুনেছি। তা ছাড়া নানা বিভিন্ন জায়গায় কত মেয়ের সঙ্গে দলের লোক ও বন্ধু হিসাবে মিশেছি কিন্তু আমি দেখেছি যে বেশীর ভাগ মেয়েই কোন মহৎ প্রেরণায় উন্মাদ হয়ে উঠতে পারে না। আইডিয়া নিয়ে মাত্‌তে পারে শুধু পুরুষ। তাই দেখ না, পৃথিবীর যত ভবিষ্যৎ-বক্তা, ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা প্রায় সবাই পুরুষ। কি জানি কেমন করে মেয়েরা বস্তুর সঙ্গে পরস্পরের সম্বন্ধ-গত তত্ত্বটার সন্ধান পায়, কোনটাকে সে আলাদা করে বড় করে দেখতে পারে না। পুরুষ কিন্তু বস্তুকে দেখে তখন যখন সেটা বড় হয়ে দাঁড়ায়, অন্য বস্তুকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে যায়। এই বড় করে তোলবার শক্তি এবং যা-কিছু বিরাটের উপর তার অতি-ভক্তিই পুরুষের উন্মাদনার মূল। তারা যদি সত্যই উন্মাদ না-ও হয়, তবে এমনতর মেতে উঠে যে, পাগল বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—তোমার কথায় মোটেই সায় দিতে পারলুম না। পুরুষদের

থেকে মেয়েরা একটুও ভিন্ন নয়। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, পুরুষরা ভাবতে ভালবাসে যে মেয়েরা ভিন্ন প্রকৃতির। একবার একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এবং আমি তাকে ভালোও বেসেছিলুম। তার অর্থ ছিল কিন্তু আমি ত চিরদরিদ্র। সে মহাজন দলের একজন, আর আমি সে দলের বাইরে। রাস্তার মোড়ে সোশিয়ালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতার সময় একদিন তাকে প্রথম দেখি। তার পর দিন থেকে মেয়েটি প্রায়ই আমার বক্তৃতা শুনতে আসত।

একদিন সে আমায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করলে; আমি তার বাড়ীতে গেলুম। সে বিধবা, কিন্তু তার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল বলে মনে হ'ল। তার সঙ্গে যখন ক্রমে ক্রমে আলাপ জমে উঠল আমি তাকে বার্নার্ডশ'র বই পড়তে দিলুম। ক্রমে আনাতোল ফ্রাঁস প্রভৃতির রচনার সঙ্গেও তার বেশ পরিচয় হ'ল। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে যেমন গাছগুলি সবুজ শোভায় দ্রুত বেড়ে উঠে তারও মনের তেমন প্রসার হতে লাগল—কত শীগ্‌গির তা নবীন হয়ে উঠল। কিন্তু বুঝেছ তো আমিই তাকে ভালবেসেছিলুম, সে তো আমায় ভালবাসে নি। অন্ততঃ আমি যতখানি বেসেছিলুম ততখানি তো নয়ই। কাজেই একদিন খুব বোকা বনে গেলুম। আমি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলুম। সে বল্লে, না।

বিয়ে না করবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে—মেয়ে বা পুরুষ যতবার খুশী বিয়ে করতে পারে কিন্তু জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন প্রেমের অভিজ্ঞতা পচা-গলা ফলের মত নেহাত পানসে লাগে। ভালবাসার উপর আর এই সব প্রেমিকাদের উপর আমার বিরক্তি ধরে গেছে। এরা মনে এত স্বার্থপর যে, মনে করে যে তারা যেন নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে। তুমি তো দেখছ, আমি সত্যই এ স্বার্থের ও আত্মম্ভরিতার গণ্ডী কাটিয়ে উঠেছি, নিজেকে বিলিয়ে দেবার আর আমার সাধ নেই।

আমি তখন তাকে বল্লুম—দেখ, তুমি এমনি করে আমায় ব্যথা দিচ্ছ।

সে বল্লে—ভালবাসা লোককে এমনি অভিমানী করে তোলে যে, সবেতেই তারা ব্যথা পায়।

সে রাত্রেই তাকে ছেড়ে চলে এলুম। এক সপ্তাহের মধ্যেই তার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলুম, অমুকের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তুমি গির্জ্জায় এসে আমার পক্ষের একজন সাক্ষী হলে খুব খুশী হবো।

আমি বিস্ময়ে ও ভয়ে ভাঙ্গা গলায় বল্লুম—ধ্যেৎ!

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—সত্যি, সে ঠিক পুরুষের মতই ব্যবহার করেছিল, কারণ আমিও

একমাসের মধ্যে বিয়ে করে বসলুম।

আমরা তিন জনেই সবিস্ময়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম—তুমি বিয়ে করেছ?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—বিলক্ষণ! আমার বিয়ে হয়েছিল, ভালবাসাও পেয়েছিলুম, তারপর এল চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ির পালা।

আমি বল্লুম—তার মানে?

সে বল্লে—ভার্জ্জিনিয়ায় একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, প্রায় আটমাস তার সঙ্গে ঘরও করেছিলুম। কিন্তু তারপর দেখলুম যে, রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে যেমন আমার কোন ভালবাসা নেই, তার সঙ্গেও তাই। যেদিন খুব ভাল করে বুঝলুম যে, আমরা দু'জনেই বিরক্তিকর একঘেয়ে যৌন-কামনার বিড়ম্বনা ভোগ করা ছাড়া আর কিছু পাচ্ছি না, সেইদিনই আমি তাকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। তার যে কি হ'ল সে খবর কেউ জানে না। সে আজ প্রায় ষোল বছরের কথা—কিন্তু তবু আমার মনে হয় যে, যদি আমি ভার্জ্জিনিয়ায় ফিরে যাই তো দেখবো আজও সে আগের মত স্থূল, শান্ত ও বোকা আছে এবং জীবনে সুখী হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ জীবন যে সুখের নয় এ যে শুধু জ্ঞানের পথ, একথা সে জানে না।

জেরী বল্লে—এ যে জ্ঞানের পথ এ তোমায় কে বল্লে?

ফ্র্যাঙ্ক—তা জানি না—অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়।

জেরী বলে উঠল—উঁহু, প্রাচ্যের লোকেরা ঠিক কথাটা বলেছেন। কামনার জালে জড়ানো জীবন একটা সমস্যা। জীবনের সমস্যা হচ্ছে, কেমন করে সে এই কামনাকে প্রকাশ করবে। প্রতীচ্যে আমরা জীবনকে জ্ঞানের সমস্যা বলে মনে করি, তাই দেখ না, কি জটটা পাকিয়ে তুলেছি। সমস্ত প্রতীচ্য সভ্যতা, অন্ধতা ও অজ্ঞানতার একটা বিরাট মোহজাল। প্রাচ্যের লোকেরা এত জ্ঞান-জ্ঞান করে মরে না, কাজেই অজ্ঞানতায় তারা এত ব্যথাও পায় না। তারা শুধু তাদের কামনার প্রকাশ নিয়ে আছে। ব্যস্, না-হয় তারা কামনার নিরোধ করতেই ব্যস্ত—তা হলেই সব গোল চুকল, আর আমরাই কেবল আশা-মরীচিকার লক্ষ বিড়ম্বনা ভোগ করে মরছি।

আমি এবার জিজ্ঞাসা করলুম—তাহলে তুমি কি আমায় ভারতবর্ষে ফিরে যাবার পরামর্শ দিচ্ছ?

জেরী বল্লে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আমি বল্লুম—বাঃ, তাহলে মানুষের ভবিষ্যতের কি হবে?

জেরী বল্লে—আরে রাখো তোমার মানুষের ভবিষ্যৎ, মনুষ্যত্বের গর্ব্ব! তোমার এই মনুষ্যত্ব একটা প্রকাণ্ড নর্দ্দমা যার মধ্য দিয়ে আমরা সবাই চলেছি—আমাদের চলার পথ যদি বন্ধ না হয় তবে এ নর্দ্দমা সাফ করবার তো কোন দরকার দেখি না। তোমার মত হলে, আমি আজই ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে গাছের তলায় বসে আমার ধ্যান-ধারণায় মন দিতুম। প্রতীচ্যে আমরা আদর্শ ও ধ্যান-ধারণাকে ব্যবসার বস্তু করে তুলেছি; কবির গড়া কল্পলোককে (Utopia) আমরা এমন বাস্তব করে তুলি যে লোকের আর তাতে কোন আগ্রহ থাকে না। তোমাদের আর কিছু না থাক, ধ্যান করবার শক্তি আছে। আমাদের সেটুকুও যে নেই।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তাহলে নৈরাজ্যের (anarchy) কি হবে? পৃথিবীতে আমরা যে নৈরাজ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করব, তার কি হ'ল?

জেরী বল্লে—দেখ, এনার্কিজম হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যা কেবল সুস্থ সবল মনের পক্ষেই পাওয়া সম্ভব! আত্মার এই ভাবকে তোমরা একটা শিক্ষা-সমস্যায় পরিণত করছ কোন্ দরকারে শুনি? সমস্ত প্রতীচ্যে মানুষের মনের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, লোকশিক্ষা খুব প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু তারা জানে না যে, আকাশের তারা যেমন পেড়ে আনা অসম্ভব, সাধারণ লোককে এনার্কিজম শিক্ষা দেওয়াও তেমনি।

ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞাসা করলে—জেরী, তোমার তৃতীয়বারের জেল-অভিজ্ঞতার কথা বললে না?

জেরী বল্লে—তৃতীয়বারে আমি সত্যই জেল খেটেছি। আচ্ছা, তোমরা কেউ কখনও চুরি করেছ?

আমি আর লিও এ বিষয়ে আমাদের অক্ষমতা ও অনভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে গম্ভীরভাবে শুধু মাথা নাড়লুম। বয়সে বড় বলে ফ্র্যাঙ্কের এ বিষয়ে কোন বৃথা অভিমান ছিল না, সে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি চুরি করেছিলে জেরী?

জেরী বল্লে—আমি চেক জাল করে পাঁচশ' ডলার চুরি করেছিলুম।

—ধরা পড়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কতদিনের জেল হয়েছিল?

—এক বছরের।

আমি বল্লুম—তুমি একাজ করলে কেন?

—অভিজ্ঞতার জন্য, তা ছাড়া টাকাটাও আমার দরকার ছিল।

—এত টাকায় তোমার আবার কি দরকার হয়েছিল ?

—সেই যে কুটনীর কথা বলেছি না, সে মেয়েটার জন্য দাম দিয়েছিল তাই কোনমতে মেয়েটাকে ছাড়তে চাইছিল না ; মেয়েটি শহর ছেড়ে গেলে তার হয়ে আমি তাকে পাঁচশ' ডলার দিয়েছিলুম। আমার মনে হ'ল স্ত্রীলোকটাকে শান্ত করবার এইটেই সব চেয়ে ভাল উপায়। মেয়েটি বিয়ে করে ভদ্রজীবনে আশ্রয় পেয়েছে ও আর তাকে যাতে বিরক্ত না করে এই ছিল আমার অভিপ্রায়।

—কার চেক তুমি জাল করেছিলে জেরী ?

—দোকানের মালিকের। সে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, সেই অবস্থায় তাকে বোঝালুম যে সে নিজের হাতে সই করে আমায় পাঁচশ' ডলার দিয়েছে।

—কিন্তু তুমি যে বল্লে তোমার এক বছরের জেল হয়েছিল।

—তা তো হয়েছিল, কারণ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মালিক আমায় চেক সই করে টাকা দেওয়ার কথা অস্বীকার করলে।

—কাজেই তুমি একবছর জেল খাটলে ?

জেরী বল্লে—হ্যাঁ, জেলে একটা জিনিস শিখলুম। মহৎ বা বিপুল প্রেমের শক্তি মানুষের নেই এবং এই অক্ষমতা ঢাকবার জন্যই সে দয়া করতে এত ব্যস্ত। পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষের ওপর খৃষ্টধর্ম্মের আধিপত্যের কারণ জান কি ? এরা যে যীশুখৃষ্টকে ভালবাসে তা নয়। বহুভারাক্রান্ত ব্যথিতের জন্য যীশুর করুণা এদের মুগ্ধ করেছে। জীবননাট্যে প্রেমিকের মহৎ ভূমিকা সাধারণ মানুষের জন্য নয়—ভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে সামান্য করুণার মাঝখানেই সে স্ফূর্ত্তি পায় এবং খৃষ্টধর্ম্মের এই সামান্য দিকটাই পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের কাছে মহৎ ধর্ম্ম বলে গৃহীত হয়েছে।

লিও বল্লে—আচ্ছা জেরী তোমার দিক থেকে মেয়েটিকে কি তুমি ভালবাসনি ?

জেরী বল্লে—না, তাকে দেখে আমার দয়া জেগেছিল, তাকে ভালবাসিনি আমার বিশ্বাস খাঁচার পাখী বা কাঠবিড়ালী ছাড়া আমি আর কিছুই ভালবাসতে পারি না।

আমি একবার ফাঁক পেয়ে বল্লুম—সেই যে কুকুরওয়ালার দোকান যেখানে পাখীও বিক্রি হয় সেখানে তোমায় একদিন দেখেছিলুম, তা আমার মনে আছে। মাঝে মাঝে কোন রকমে পয়সা জমিয়ে তুমি পাখী বা কাঠবিড়ালী কিনে পার্কে ছেড়ে দাও, আমি সে কথাও জানি !

জেরী সে কথা স্বীকার করে বল্লে—হ্যাঁ, ও জিনিসটা আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। হাতে পয়সা পেলেই আমি দোকানে গিয়ে যা হোক একটা কিনে

বেচারীকে মুক্তি দিই। হায় ভগবান্ আমাদের কেন তুমি মহৎ প্রেমিক করে গড়লে না—আমরা সব সময় করুণা নিয়ে ব্যস্ত। আমরা সবাই যা-কিছু করি এই সামান্য করুণার গণ্ডী ছাড়িয়ে তা কোনদিন উঠে না।

আমি বেশ বুঝলুম যে যদি শহরে থাকি তবে কিছুদিনের জন্য কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে এদের সঙ্গে কথা কয়ে আর ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েই আমার দিন কাটবে। আমি দেখলুম তাতে কিছু লাভ নেই। কাজে গিয়ে টাকা জমিয়ে আমার কলেজের পড়া শেষ করতে হবে। ফ্র্যাঙ্ক অবশ্য মাসে মাসে চল্লিশ ডলার দিতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু তার টাকা নিতে আমার একটুও মন সরছিল না। কাজেই দূরে কোথাও কারখানার কাজ নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবার ইচ্ছা হ'ল। যাবার আগে পুরো একপক্ষ দলের সঙ্গে বেশ স্ফূর্ত্তিতে কাটাব ঠিক করে ফ্র্যাঙ্ককে খবর দিলুম যে সে যেন এ-কয়দিন আর না আসে ; কারণ আমি জেরী আর লিওর সঙ্গে এক বিছানায় শোব।

পরের দিন ঘণ্টায় পঁচিশ সেণ্ট হিসাবে কিছু ঠিকে কাজ করে প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আমি আমাদের ভাড়াটে ঘরে ঘুমোবার জন্য গেলুম। দেখি জেরী মুখ ভার করে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বল্লুম—কি জেরী, ব্যাপার কি ?

সে বল্লে—সব ছেড়ে দিলুম।

তার কথার মানে না বুঝতে পেরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—ছাড়লে কি ?

জেরী জোর করে বল্লে—আমি সে বিছানাটা ছেড়ে দিয়েছি !

আমি—তার মানে কি ? আমি যে ঘুমবো বলে এলুম।

ধরা গলায় জেরী বল্লে—তুমি হয়ত বুঝবে না, কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। সকলে মিলে বিছানাটা সমস্ত ক্ষণ ব্যবহার করছি—হয় তুমি, নয় আমি, নয় লিও—কেউ-না-কেউ সেই বিছানায় শুচ্ছি। ব্যাপারটা একবার ভাবো দেখি,—বেচারা বিছানা এ-পর্য্যন্ত একদণ্ড বিশ্রাম পেলে না। তাই আমি ছেড়ে দিলুম। না, না, এমন করে বিছানাও সারাক্ষণ আত্ম-প্রয়োজনে লাগানো উচিত নয়। এইবার কতকগুলো কাঠবিড়ালী কিনে পার্কে ছেড়ে দিতে যাচ্ছি।

আমিও এবার মন বাঁধলুম, জেরীকে বল্লুম—বেশ কথা ; তোমার বিছানা খুশীমত ছেড়ে দেবার অধিকার অবশ্যই তোমার আছে। আমরা সবাই স্বাধীন,

কেউ কারো কাছে ধারি না। যাই হোক, আমি কালই কারখানায় চলে যাচ্ছি।

আমার পক্ষে সেইটেই যে বুদ্ধিমানের কাজ জেরী তা স্বীকার করলে। সে বল্লে—দেখ, তুমি অন্য এক সভ্যতার আওতায় মানুষ হয়েছ, এ ভবঘুরে জীবনের কষ্ট সহ্য করবার মত তোমরা টঙ্ক নও। বাঁচবার জন্য তোমাদের আশ্রয় চাই। স্বাধীনতার এই যে কষ্টময় জীবন এ যেন নরক। গায়ে কাপড় নেই, পেটে অন্ন নেই, কিন্তু তবু লোকেরা এই স্বাধীন জীবন ভালোবাসে। আচ্ছা, বিদায়। তুমি তা হলে কারখানাতেই যাও, আশা করি মাঝে মাঝে দেখা হবে।

আমি ক্যানিংটন বলে এক শহরে কারখানার কাজে যোগ দিলুম। দিনে আমাদের বারো ঘণ্টা করে কাজ। দিনে ও রাতে আলাদা লোক লাগিয়ে কারখানাটা চব্বিশ ঘণ্টাই চলত। চিঠি লিখে লিখে এই কারখানায় আমি রসায়নবিদের সহকারীর পদ পেয়েছিলুম।

প্রথম দিন ল্যাবরেটরীতে যেতেই প্রধান রাসায়নিক যখন বল্লেন—তুমি এই জিনিসটা বিশ্লেষণ করে দাও তো, তখন আমায় স্বীকার করতে হ'ল যে আমি রসায়নের ক-অক্ষরও জানি না, শুধু কলেজের খরচ জোগাবার জন্যই এ-কাজ আমায় বজায় রাখতেই হবে। ভদ্রলোক আর কি করেন, তবে আমাকে কাজ বজায় রাখবার মত সুবিধা করে দিতে তিনি স্বীকৃত হলেন।

তিনি পরামর্শ দিলেন—দিনে বারো ঘণ্টার বদলে তুমি অন্ততঃ ঘণ্টা চৌদ্দ কাজ কর। তুমি বরং বিশ্লেষণগুলো মুখস্থ করে নাও; সপ্তাহে একঘণ্টা করে খাটলে তুমি শীগগির চিনির রসায়নবিদ বলে নিজেকে চালাতে পারবে। চিনির রসায়ন সম্বন্ধে অনেকেই কিছু জানে না আর যারা তা জানে তারা অন্য কিছু জানে না।

সুতরাং আমি নানা রকম অদ্ভুত কথা মুখস্থ করতে সুরু করলুম। Polarization, evaporation, carbonization, carbonation—কি সব অদ্ভুত বিচিত্র কথার মালা; মনে হ'ত যেন হিমালয়ের তরাই থেকে জানোয়ারের দল সার বেঁধে ঘুরছে। আমার উপরওয়ালা লোকটি ছিল খুব চমৎকার। সে দাম্ভিক, ইতর আর জঘন্য হলেও খুব দয়ালু ছিল। তার হৃদয়টা ছিল হাতীর মত প্রকাণ্ড। মনে মনে সে কর্ম্মী সমবায় নির্দ্ধারিত কাজের পরিমাণে বিশ্বাস করলেও বাইরে বলবার সময় সে বারো ঘণ্টা কাজের পক্ষেই ভোট দিত।

যাই হোক, কারখানার কাজ চলতে লাগল। একবার ভোর ছটায়, একবার

দুপুর বারোটায়, একবার সন্ধ্যায়, আর একবার মাঝরাতে, এমনি করে ছ'ঘণ্টা অন্তর কারখানার বাঁশি বাজত। তপ্ত উনুনের চারদিকে আরসোলার মত এই বিরাট দানবের কুক্ষির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভয়ে ভয়ে বিচরণ করত। সে এক বীভৎস দৃশ্য! এই কারখানার কয়েকজন মজুরের মুখে যে জঘন্য ইতর কথা শুনেছি সে রকম আর কোথাও শুনিনি। আমাদের দেশের সাধারণ ইতরতার কথা আমার জানা আছে, কিন্তু তার মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল। আর এখানে দেখি শুধু নগ্ন কুৎসিত ইতরতার বীভৎস-ক্লিন্ন প্রকাশ।

এ জায়গাটা ছিল ভয়ানক বিশ্রী। এখানকার চারশ মজুরের মধ্যে অধিকাংশই অবিবাহিত, তাই এদেশী ভাষায় একে তারা বলত 'লাল-বাতি পরগণা' (Red light district), কারণ এখানে মাত্র তিনটি স্ত্রীলোক ছিল। মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যেত যে দলের পর দল লোক সার বেঁধে এই সব বাড়ীর মধ্যে যাওয়া-আসা করছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনাচারের মধ্যেও কি বিষম পার্থক্য!

প্রাচ্যের গণিকা কলাবিদ রমণী। সে নাচ-গানে সিদ্ধা; নর্ত্তকী ও গায়িকা বলেই তার বেশী আদর, কেবল মাত্র রমণী হিসাবে সে লোককে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু এই জঘন্য কারখানা—শহরে মানুষের দেহ ও মন শূয়ার-গরুর মাংসের মত ব্যবসার বস্তু।

সেদিন ভারী গরম পড়েছিল; রাত্রে কাজের শেষে বিশ্রামের অভাবে খুব ক্লান্ত হয়ে ও অতি শ্রান্তি বশতঃ অনিদ্রায় শহরে টহল দিচ্ছিলুম। পথ চলতে চলতে কি একটা কিনব বলে সামনের দোকানে ঢুকে দেখি একজন স্ত্রীলোক খুব সাজ-গোজ করে দাঁড়িয়ে আছে; আমায় দেখে মিষ্টি হেসে নমস্কার করে চলে গেল।

এমনি করে প্রথম দেখা হবার প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বল্লে—এস না, আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে!

বেড়াতে বেড়াতে দু'জনে পার্কে গিয়ে বসে প্রায় ঘণ্টা দুই গল্প করলুম। আমি তাকে আমার কলেজ জীবনের কথা কিছু কিছু বললুম আর সে তার জীবনের লাঞ্ছনার করুণ ইতিহাস আমায় শোনালে—তার ব্যথায় আমার সত্যিকার সহানুভূতি আছে দেখে কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল। শুনলুম সে এক বিখ্যাত নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কিন্তু তার অধঃপতনের জঘন্য কাহিনী আর না-ই বা বল্লুম।

মনে মনে ব্যথার ভার জমিয়ে অসুখী হয়ে কোন লাভ নেই—সত্যি বলছি, আমি মোটেই অসুখী হতে পারি না। আমি যখন এমনি করে কথা বলি তখন

মনে হয় যেন সমস্ত সত্যটা বলছি না—এই বলে তার কথা শেষ করে সে বল্লে—আচ্ছা, এইবার আমি উঠি ; যাবার সময় হ'ল, প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজেছে।

দাঁড়িয়ে উঠে, সেকহাণ্ড করে সে চলে গেল। আমি বুঝলুম যে শীগগির ছ'টা বাজবে আর যৌন-লালসার শূয়ারের খোয়াড়ে দিনভোর কাজের খোয়ারি ভাঙ্গতে মানুষ-জানোয়ারের দল নারকীয় পঙ্কস্নানে মাতবে! আমি আস্তে আস্তে কারখানায় কাজ করতে চলে গেলুম।

কারখানায় গিয়ে এক তর্ক বাধল। আমার উপরওয়ালা আমায় ডেকে বল্লে যে, রাস্তায় একজন নোংরা স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমায় বেড়াতে দেখা গেছে।

আমি বল্লুম—তাতে হয়েছে কি?

সে বল্লে—হবে আর কি, ঐ স্ত্রীলোকদের পথে দেখলে কেউ তাদের চেনা বলে স্বীকার করে না। বেশ মানলুম যে অনেক লোকই তাদের বাড়ীতে ঐসব স্ত্রীলোককে চেনে জানে। সে ত তাদের চেনবার জায়গা। কিন্তু শহরের রাস্তায়, প্রকাশ্যভাবে যদি কেউ তাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে, তবে সে নোংরা কুকুর ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি যদি আর কখনও ঐ স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাস্তায় ঘুরে বেড়াও তবে তোমার চাকরিও যাবে, এ শহরও ছাড়তে হবে।

আমি জেদ ধরলুম—কিন্তু অনেক লোকই ত ওকে জানে।

সে স্বীকার করলে—জানে, কিন্তু পরগণার বাইরে কেউ তার সঙ্গে কথা কয় না—তার আস্তানার বাইরে সে যদি যার-তার সঙ্গে মিশতে পায় তবে সমাজ ত একেবারে নরক হয়ে উঠবে। তাহলে কিছুদিনের মধ্যে ঐ সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভদ্রমহিলার কোন তফাতই থাকবে না। যাই হোক, সাবধানে থেকো, তা নাহলে শীগগিরই চাকরিটি খোয়াবে—কেউ হয়ত তোমার মাথাটাও ফাটাতে পারে, কে জানে?

এদের নির্লজ্জ ইতরতা ও বেয়াদবির পরিমাণ আমার কাছে দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। লোকের পর লোক এসে আমায় শাসিয়ে গেল যে, যদি আবার আমায় কেউ ঐ স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কইতে দেখে, তবে আমায় শহর থেকে দূর করে দেবে। তার যে জায়গা, তার বাইরে আমি যেন তার সঙ্গে কথা না বলি।

এই সব কথায় আমার রক্ত আগুন হয়ে গেল। আমি বল্লুম—তার কোন জায়গা তা আমি জানি না, তোমাদের মত লোকেরাই সে খবর রাখতে পারে।

হঠাৎ কলের চাকা থেমে গেল—তখন রাত প্রায় বারোটা। কলের গুম গুম

আওয়াজ বন্ধ হ'ল, মনে হ'ল যেন এক বিরাট দানব অলসভাবে শুয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে। সব আলোগুলো নিভে গেল এবং সর্বত্র ছোট ছোট বাতি নিয়ে লোকেরা এঞ্জিনের গলদ খুঁজে দেখতে লাগল। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এঞ্জিন থামল কেন?

ক্রমে জানা গেল যে, 'ডাইনামো' ঘরে একটা টিকটিকি ঢুকে পড়েছিল ; তাই এই বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটেছে! এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় আমার কোন দখল না থাকায়, তারা যা আমায় বল্লে তার মাথামুণ্ড কিছু বুঝলুম না। কারখানা ঘরের সেই অন্ধকারে ছোট ছোট বাতির আলোতে আমি রাসায়নিককে শেকসপীয়র থেকে আবৃত্তি করে শোনালুম ; "We are such staff as dreams are made on and our little life is rounded with sleep."

আমার উপরওয়ালা তা শুনে বল্লে—অত কাব্যি কিসের জন্যে শুনি?

আমি বল্লুম—গানের উৎস হচ্ছে ব্যথা এবং ব্যথার মুক্তি গানে।

সে বল্লে—ছোকরা, গানে তো আর রুটি মেলে না।

—না, কিন্তু মনের রস জোগায়।

কেজো লোকটি বলে উঠল—তাই নাকি হে? বাবাজী, তুমি কেমিষ্ট্রির ক-অক্ষর জানো না অথচ কাব্যিতে ত বেশ পাকা, এবার কেমিষ্ট্রি শিখে অন্ন কর না কেন? কাব্যি করে ত পেটে না খেয়ে, টেনা পরে আছ ; একেবারে বুভুক্ষু ইঁদুরের হাল হয়েছে, সে কথা কি কোনদিন ভেবেছ?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তাতে লাভ কি বল?

সে বলতে লাগল—কি, ওমনি করেই কথা বলবে নাকি? বেশ, তাহলে একটা হল ভাড়া করে মনের সাধ মিটিয়ে বক্তৃতা করগে। আমি যখন কলেজে কেমিষ্ট্রি পড়তে গেলুম, তারা বল্লে, কাব্যও পড়তে হবে—মজা মন্দ নয়, তুমি চাও কেমিষ্ট্রি নিতে আর তোমার জন্য শেকসপীয়র, ডিকেন্স আরও কত শৌখিন রচনা বরাদ্দ হ'ল। কাজেই কি জগা-খিচুড়ীই তারা বানিয়ে তোলে।

আমি বল্লুম—বুঝছ না, জবরদস্তি করে শেকসপীয়র পড়ালে কোন মতেই তা কারুর ভালো লাগে না। তা ছাড়া কোন বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হলে সে বিষয়টা এমন নীরস হয়ে ওঠে যে আজীবন তুমি তার উপর বিরক্ত হয়ে থাকবে।

কারখানার বাঁশি বেজে উঠল, বিজলী বাতিগুলো জলে উঠল। সেই মহাদানব কিছুক্ষণ হাঁপ নিয়ে গোঙ্গাতে লাগল এবং তারপর এঞ্জিনের চাকাগুলোর ভীষণ

আওয়াজে অন্য সব শব্দ চাপা পড়ে গেল।

কি জানি কেন, পরের দিন ক্যানিংটনের কাজ ছেড়ে প্রথম ট্রেনেই সানফ্রান-সিসকোতে ফিরে গেলুম।

সানফ্রানসিসকোতে এসে দেখি এর মধ্যে কলেজ খুলে গেছে। কাজেই মাইনে দিয়ে পড়া সুরু করলুম। এবার এক নিগ্রো স্ত্রীলোকের অধীনে খুব ভাল কাজ পেলুম, সেই ঘর সাফ করা, বাসন ধোওয়া আর পরিবেশন করা। এনার্কিজমের প্রতি আমার আগ্রহের এবার অবসান হয়ে আসছিল। আমি উপলব্ধি করছিলুম যে একটা নব্য দর্শন আবিষ্কার করা ছাড়া আমার অন্য কোন পন্থা নেই এবং সে দর্শনে মানুষের বাস্তব উন্নতির স্থান খুব কমই থাকবে। এই সময়টাতে আমি আবার নূতন করে যেন ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করতে লাগলুম, নিত্য নূতন আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতায়।

তখন উনিশ শ' বারো খৃষ্টাব্দের হেমন্তকাল। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ও নানাবিধ আন্দোলন নানা আকারে নিজেকে প্রকাশিত করছে। বিদ্যা ও জ্ঞান সংগ্রহের লোভে দলে দলে ভারতীয় ছাত্রেরা এখানে এসে জুটছিল এবং যতই এদের আসতে দেখতুম ততই আমার মনে হ'ত যে এরা মরুভূমির সুদূর মরীচিকায় পিপাসাশান্তির ব্যর্থ আশায় ছুটেছে।

এতদিন ধরে আমি পাশ্চাত্য সভ্যতার তলানি ময়লাটা পর্য্যন্ত আকণ্ঠ পান করেছি, এর ভিতরকার সমস্ত নোংরামি, জীবনের প্রতি অগাধ ঔদাসীন্য, এর সমস্ত জুয়াচুরী, ভণ্ডামি সবই আমার কাছে ধরা পড়েছে। সত্য ভারত সে-যুগে যে সমস্ত ভুল করেছে সুসভ্য আমেরিকাও সেসব ভুল-চুক-গ্লানির হাত থেকে রেহাই পায়নি। অথচ সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উভয় সভ্যতাতেই বিরাট একটা কিছু গড়ে তোলবার মালমশলার অভাব ছিল না।

যতগুলি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল তারা সবাই স্বদেশপ্রেমিক। তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চায়; যেন রাজনৈতিক অধীনতা-পাশ-মুক্ত হলেই ভারতবর্ষ তার ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বপ্রকাশ হয়ে উঠবে। এই সব ছেলেদের অনেকের সঙ্গে আমার বহু তর্ক হয়েছে। এরা মনে করত যে ভারতের যদি স্বাধীন শাসনতন্ত্র, নিজের সৈন্য ও জাহাজ ও কতকগুলি কল-কারখানা থাকত তবে সে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর বহু সভ্যদেশের অন্যতম হয়ে উঠত।

একজন ভারতীয় বিদ্রোহ-পন্থীর কথাই বলি। সানফ্রানসিসকোর অনেকেই

তাকে আজও ভোলেনি। প্রত্যেক ভারতীয় বিশ্বাসঘাতকের মুণ্ডচ্ছেদনের তার যেমন অদম্য আগ্রহ ছিল, প্রত্যেক ইংরেজ কর্ম্মচারীর প্রতিও তেমন একরকম নেকনজরে চাইবার তার উৎসাহ ছিল প্রচুর। সে লোকটি ভারতব্যাপী যে বিরাট হত্যাকাণ্ডের স্বপ্ন দেখত তাতে তাকে আমার 'মরণের মহাকবি' বলে মনে হ'ত। দেশভক্তিরূপ দেবতার চরণে সে বিরাট অর্ঘ্যের মত প্রকাণ্ড মৃত্যুহোমের ধ্যান কোরত। দেশকে রাজনৈতিক নরকের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করতে ও নূতন নরক নিবারণ-কল্পে সে ইংরাজ-সৈন্য-ভর্ত্তি কেল্লাগুলো উড়িয়ে দেবার নানা অদ্ভুত উপায় নিজের বুদ্ধিতে প্রায়ই আবিষ্কার করত, আর মাঝে মাঝে স্বাধীন জাতির মধ্যে থাকবার তার আনন্দ কাব্যের ছন্দে মূর্ত্ত হয়ে উঠত। সে ভারী সব রমণীয় হত্যাকাণ্ডের ও কমনীয় সংহার-লীলার কল্পনায় মশগুল থাকত।

একদিন আমি তাকে বল্লুম—আচ্ছা দেখ, ইংরেজের বদলে আমাদের এ হত্যাকাণ্ড দেশে চালিয়ে লাভ কি? হয়ত আমাদের অত্যাচারটা একটু উদারনৈতিক হতে পারে। কিন্তু তাদেরটা ত বেশ প্রয়োজনপন্থী ও কার্য্যকরী বলেই মনে হয়।

সে বল্লে—তাদের সংহারলীলা ক্রমাগতই চলেছে কিন্তু আমাদেরটা কেবল মাত্র ক্ষণিক ও বাস্তবিক অনিবার্য্য। হত্যার মধ্যেও অনপচয়ের কথাটা ভাবতে হবে। যদি মাত্র কয়েক শত লোককে বধ করে তুমি একটা স্বাধীন ভারত সৃষ্টি করতে পারো তাহলে বধ করা উচিত বৈকি। আমি শুধু লাভালাভের হিসাব থেকে কথাটা বলছি।

আমি বল্লুম—আমার ভাবনা তো ঐখানেই। তোমার এই অনপচয়-তত্ত্ব এত বৈজ্ঞানিক, তোমার এই সংহারলীলা এত স্বাস্থ্যনিয়ম-সঙ্গত যে Conic Section সম্বন্ধে যেমন আমার কোন আগ্রহ নেই, তোমার এই সবেও তেমন আস্থা নেই। তোমার এই হত্যাকাণ্ডগুলি বেশ মাপ-জোক করা বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রামাণ্য, কাজেই যদি কোনদিন এ কাণ্ড সম্ভব হয় তবে St. Bartholomew বা Russian Pogroms-এর চেয়ে তা খুব পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর হবে সন্দেহ নেই। তাছাড়া ও-সবের মধ্যে ধর্ম্মের বা ধর্ম্মাচারের সামান্য আভাস থাকাতে লোকে তা হয়ত ক্ষমা করতে পেরেছে, আর তোমাদের?

আমার মন্তব্য শুনে সে বল্লে—ক্রীতদাসের মত কথা বলছ। ইংরেজ যে আমাদের জয় করেছে তা নয়, তারা আমাদের এই বলে শাসাচ্ছে যে বিদ্রোহ মাত্রেই পাপ, একটা ধ্বংস-মূলক অনাচার। সারা ভারতবর্ষের পবিত্র তীর্থের বুক

চিরে, হিমালয়ের গা চিরে তৈরী তাদের ধর্ম্মহীন রেল পথগুলো তুমি যদি দেখতে তবে মনে হ'ত যেন মহারাক্ষস তার বড় বড় দাড়া তোমার বুকের মধ্যে ফুটিয়ে তোমার সমস্ত জীবনরস শুষে নিচ্ছে! কোনদিন যদি এসব কল্পনা করতে পারতে, স্পষ্ট উপলব্ধি করতে, তবে এখানে বসে বসে বোকার মত কথার মালা গাঁথতে না।

এমনি করে পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পের প্রভাব যে এশিয়ার পক্ষে খুবই মারাত্মক সে কথা সত্য বলে স্বীকার করে বললুম—এ বস্তু যে এশিয়ার জীবন-রস শুষে নিচ্ছে তা জানি কিন্তু সে ঝগড়া তো তাহলে ইংরেজের সঙ্গে নয়, পাশ্চাত্য মহাজনী ব্যবস্থার সঙ্গেই হওয়া উচিত।

সে মাথা নেড়ে বল্লে—না, যদি আমাদের নিজের দেশের লোক দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করত আর যদি আমাদের নৌ-বল ও সৈন্য-বল থাকত, তবে সমস্ত টাকাটা দেশেই খরচ হ'ত এবং দেশেই থেকে যেতো। ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারীদের মাইনে দিতে বিদেশে টাকা পাঠাতে হ'ত না। একবার ভাবো দেখি! যদি সমস্ত লাভের অংশ ভারতে ভারতবাসীর মধ্যে ভাগ কোরে দেওয়া হ'ত তাহলে দেশের অবস্থা আজ কত সমৃদ্ধ হতে পারত!

সুতরাং সে চায় ন্যাশানালিজম দিয়ে ইম্পিরিয়ালিজম জয় করতে অথচ দুটোই সমান অসম্পূর্ণ ও পরস্বলোলুপ। সে-কথা আমি তাকে জানিয়ে বল্লুম—কিন্তু দেখ, তোমার কথাগুলোর এ-রকম একটা ব্যাখ্যা দিতে আমার ইচ্ছে নেই।

সে বল্লে—আমার কথা তুমি যে অর্থেই নাও তাতে আমার কিছু এসে যায় না! তোমার ধ্যান-ধারণায় পাশ্চাত্য কালিমার ছাপ পড়েছে তাই তুমি তাদের দিক থেকে আমাদের বিচার করছ—তুমি একটা দাস বনে গেছ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা, দুটো শ্রেণী হিসাবে ব্যাপারটাকে দেখছ না কেন? জগতে মাত্র দু'দল আছে, এক দল যারা সঞ্চয় করে সম্পন্ন হয়েছে, আর আর এক দল যারা সব থেকে বঞ্চিত। বিশ্বজুড়ে এই যে সংঘাত জেগেছে সে হচ্ছে এই পরস্পর-বিরোধী দলে যুদ্ধযাত্রা, অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়। ইম্পিরিয়ালিজম আর ন্যাশানালিজমের মধ্যে আমি ত বিশেষ কোনো তফাৎ দেখি না। আমার এই কথায় তার মন্তব্য হ'ল যে আমি আত্মাহীন সোশিয়ালিষ্টদের মত কথা বলি।

আমি অস্বীকার করলুম—আমি সোশিয়ালিষ্ট নই—তাদের মতবাদ আমি ঘৃণার চোখে দেখি। পুরানো প্রভুত্বের বদলে সোশিয়ালিষ্টরা একটা নূতন

জবরদস্তি খাড়া করতে চায় আর আমি চাই মানুষের মনে একটা স্বাধীনতা বোধ জাগিয়ে তুলতে—কারণ সেই পথেই হবে কল্যাণ।

সে রেগে উঠল—মনের কথা বলতে লজ্জা করে না, অনাহারে এদিকে দেহ যে মরবার দাখিল, তার কি? অন্নাভাবে যে-মানুষ মরছে তার কাছে দর্শনের আলোচনা করে তাকে কোন্ সাহসে অপমান করতে চাও শুনি?

আমি সে-কথা স্বীকার করে বল্লুম—হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলেছ, কিন্তু দেহ যেদিন অন্ন-পুষ্ট হবে সেদিন আত্মার আলোচনা তো অবান্তর নয়। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের মতে এইটাই ছিল সব চেয়ে প্রধান জিনিস?

আমার কথা শুনে সে ক্রমাগতই চটে যাচ্ছিল, এবার ব্যঙ্গের সুরে বল্লে—তোমার পূর্ব্ব-পুরুষদের সম্বন্ধে কি জানো বল ত?

বিরোধ মেটাবার জন্য আমি অন্য পথ ধরলুম, তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা, বল ত, কেমন করে আমি দেশের সেবা করতে পারি?

সে বিরক্ত হয়ে বল্লে—মুখ বুজে থেকে।

যাই হোক, ভারতীয় ন্যাশানালিজম সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন রকমের মতামতের পরিচয় পেলুম।

সব চেয়ে একজনের কথা আমার মনকে বিশেষ করেই স্পর্শ করেছিল। সে ছেলেটির নাম দিলুম নন্দ।

নন্দ তখন সবে দেশ ছেড়ে এসেছে। একদিন তাকে বল্লুম, দেখ, আমি এদেশে আজ প্রায় তিন বছর রয়েছি এবং আমার খুবই মনে হয় যে প্রতীচ্য সভ্যতার কাছে আমাদের নূতন করে শেখবার কিছু নেই। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের ধ্যান-ধারণার মধ্যে আবার ফিরে যাওয়া। এ পৃথিবী যে ঠিক চলছে, কোথাও কোন দোষ হয়নি এ বিশ্বাস তাঁদের ছিল। পৃথিবীতে দোষ যদি কোথাও থাকে তবে তা আমাদের মধ্যেই প্রথমে ঘটেছে। সুতরাং আমাদের যত চিত্তশুদ্ধি হবে, আমরা যতই ধর্ম্মাশ্রিত হব, বিশ্বের সমস্ত সমস্যা ততই লোপ পাবে। আমাদের দেব-কল্প হতে হবে। তখন আমাদের কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, কারণ নিজেদের মনের ভিতরকার অভাববোধটা তখন আমরা জয় করতে পারব। যদি আত্মার শক্তিতে সব ক্ষুধা দমন করতে পারি তখন কোন কিছুর জন্য বা কোন কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে না। নিজেদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন সাধন করে আমরা সমস্ত বিশ্বকে স্বতঃই বদল করতে পারব। তোমার মনে আছে বুদ্ধদেব যখন গণিকার বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে

গেলেন তখন তা পবিত্র হয়ে গেল, কেবল তাঁর মত মহাত্মার আধ্যাত্মিক প্রভাবে। তাই আমার মনে হয় যে আমাদের পথ কলেজের দিকে যায়নি, তার গতি আত্মার দিকে—বুঝলে নন্দ—এ ব্যাপারে আমাদের দেশ প্রতীচ্যকে অনেক কথা শেখাতে পারে।

এতক্ষণ চুপ করে আমার কথা শুনে নন্দ উত্তর দিলে—আমি স্বীকার করছি যে আমাদের যে আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে তা পার্থিব সম্পদের চেয়ে খুব প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভারতের মাটির নীচে যে পার্থিব প্রাকৃতিক সম্পদ সঞ্চিত আছে এবং মাটির উপরে সস্তায় যে মজুর পাওয়া যায় এই দুই জিনিসের আকর্ষণে পাশ্চাত্যরা সব আত্মসাৎ করবার মতলবে দেশের বুক জুড়ে বসেছে। পাশ্চাত্য দেশের যত মূলধনী মহাজন এই দুই কারণে ভারতে এসে শুধু যে সে দেশের অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশ করছেন তা নয়, তাঁদের তথাকথিত সভ্যতার মারাত্মক আওতায় গৃহশিল্পের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধের এতদিনের বাঁধনও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আগে চাষারা নিজের জমিতে আট ঘণ্টা কাজ করত, আজ তারা পরের কারখানায় বারো ঘণ্টা ভূতের ব্যাগার খেটে মরছে। মাঠে লাঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে যে চাষা মনের আনন্দে গান ধরত, আজ সে কারখানার কাজে বিরক্তিতে ইতর ভাষায় জঘন্য গালাগালির কাদা ছড়ায়।

আমি বল্লুম—প্রতীচ্যের আমদানী এই শ্রম-শিল্পের প্রভাব থেকে প্রাচ্যকে মুক্ত করতে হলে আগে আমাদের নিজের বশে আনা দরকার। পশ্চিমের আমদানি এই যূথ-বদ্ধ লোলুপতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত হতে হলে আমাদের নিজেদের সমস্ত লোভ বর্জ্জন করতে হবে। এমনি করে নিজেদের থেকে আমাদের প্রথমে মুক্ত করতে পারলে পশ্চিমের কবল থেকে এশিয়াকে বাঁচান কঠিন হবে না, আমার মনে হয় তা আপনা-আপনিই হয়ে যাবে।

নন্দ বল্লে—হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন অগাধ, ধন-সম্পত্তিও তেমনি অতুল, আর এর পিছনে রয়েছে মনোরাজ্যের আধ্যাত্মিক বিভব। প্রতীচ্য সভ্যতা যদি কোনদিন এই বিভবের সন্ধান পেত! কেমন করে তাদের এই সম্পদের ভাগ দেব, সেইটেই তো সমস্যা। যদি পশ্চিমে গিয়ে বলি—আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে প্রচুর, তোমাদের কিছু দিতে চাই, তখন সে বলবে, 'তোমরা আবার আধ্যাত্মিক হলে কেমন করে, তোমরা যে পরাধীন? সব জিনিস যাদের করায়ত্ত, যাদের নিজের একটা অর্থনৈতিক পদ্ধতি আছে, জগতে এমন জাতই সত্যই আধ্যাত্মিক সম্পদের মালিক।' তুমিই বল, তাদের এ প্রশ্নের

আমরা কি জবাব দেব?

আমি বল্লুম—আমি জানি না, তুমি কি বল?

নন্দ বলতে লাগল—যতদিন না আমরা গায়ের জোরে পাশ্চাত্যের অধীনতা থেকে দেশকে স্বাধীন করছি ততদিন তারা প্রাচ্যের এ আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করবে না, সে সম্পদ আছে বলে স্বীকার করবে না। য়ুরোপের আধুনিক বর্ব্বরতাকে ভারতের এই আধ্যাত্মিকতা দান করতে হলে তাদের নিজের অস্ত্রে তাদের জব্দ করতে হবে। ন্যাশানালিজম ও ন্যাশানালিটি জিনিস যাই হোক, বর্ত্তমান সভ্যতায় ও-গুলো এক একটা ধাপ এবং আমাদেরও এই পথে উঠতে হবে। যতদিন না ভারত সমস্ত বিদেশী প্রভাব ও আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতায় গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে ততদিন ধনশক্তি-গর্ব্বিত কোন প্রতীচ্য দেশ আমাদের আধ্যাত্মিক কথায় কান দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নন্দর কথাগুলো ভাবতে ভাবতে জেরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। নন্দ যা বলছিল তা আমার মনে খুবই লেগেছিল। নিজের আধ্যাত্মিক সম্পদ দান করবার জন্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গুণ্ডামি রপ্ত করতে বসবে? সত্যই কি এর কোন প্রয়োজন আছে?

এই সময়ে সানফ্রানসিসকো থেকে ফ্র্যাঙ্ক তার সোশিয়ালিষ্ট সাপ্তাহিকখানি সম্পাদন করছিল এবং জেরী ও লিও তার কাছে গিয়ে জুটেছিল। ফ্র্যাঙ্ক এখন দাড়ী কামিয়ে ফেলেছে আর আমায় অর্থ সাহায্যের দায় থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের ও বন্ধুদের নতুন স্যুট কিনে বেশ একটু ভদ্র হয়েছে। আমি যখন গেলুম তখন সবাই একসঙ্গে বসে গল্প করছিল।

হঠাৎ ফ্র্যাঙ্ক আমায় বল্লে—আচ্ছা, তুমি এই স্যুটটা কতদিন ধরে পরছ বল ত?

আমি বল্লুম—দু'বছর।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—বেশ, এ সপ্তাহের মাইনে পেলে তোমায় একটা নতুন পোশাক কিনে দেব।

লিও তাতে আপত্তি করলে—সে জেদ করতে লাগল যে শুভস্য শীঘ্রম্।

সে বল্লে—এখন তারা ধারে জিনিস ছেড়ে দিতে পারে, তুমি মাইনে পেলে ধার শোধ কোরো—ঐ স্যুটটা পরে ওকে শয়তানের মত দেখাচ্ছে, আর স্যুটটি যেন ভারতের জাতীয় পতাকা—যত দূর থেকেই হোক একে আমি ঠিক চিনতে পারি।

অতএব সকলে মিলে দরজীর দোকানে অভিযান করলুম এবং একটি তৈরী পোশাক কিনে পরে নিলুম। প্রায় বছর তিনেকের মধ্যে এই আমি প্রথম নতুন পোশাক পরলুম। নব পরিচ্ছদে আমি এত গর্ব্বিত হয়ে উঠলুম যে লোকেরা আমার দিকে চেয়ে দেখছে না বলে মনে আঘাত লাগল। পুরানো পোশাকটা পরে যখন পথে বার হতুম তখন তারা ত সব সময় আমার দিকে চেয়ে থাকত!

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা একটা সস্তা হোটেলে আশ্রয় নিলুম এবং দর্শনের আলোচনা আরম্ভ হ'ল। নন্দর সঙ্গে আমার যেসব কথা হয়েছিল তা জেরীকে বল্লুম।

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—নন্দ ছেলেটি নিশ্চয় খুব বুদ্ধিমান, কি বল?

লিও বল্লে—আমার এসব ভাল লাগে না। পাশ্চাত্য intellectualismকে দাবিয়ে দেবার জন্যে ভারতের এই সব বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকেরা নিজেদের একটা প্রতিদ্বন্দ্বী intellectualism সৃজন করছে। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি যে গ্লাডষ্টোন বা লর্ড সলসবেরী খুব গম্ভীরভাবে বলছেন যে আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিকতার কল্যাণ বিতরণের জন্য আমরা পৃথিবী জয় করতে বাধ্য হয়েছি। তার শেকসপীয়ার, তার নৈতিক সম্পদ, তার আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠার অংশ দেবার জন্যই ইংলণ্ড বহু অনাকাঙ্ক্ষিত রাজ্য জয়ে বাধ্য হয়েছে। তাদের আধ্যাত্মিক সম্পদে ভাগ দেবার জন্য আমাদের আগে জয় করতে হবে এসব কথা ভারতীয়দের মুখে শোভা পায় না। তাদের কাছে নূতন কথার আশা রাখি।

অকস্মাৎ আমার দিকে ফিরে লিও বল্লে—আচ্ছা, তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে পাশ্চাত্য শাসক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে মনের দিক থেকেও ক্রমে ক্রমে জয় করছে? তোমরা তাদের ভাবেই ভাবো ও কথা বল নাকি?

ফ্র্যাঙ্ক বল্লে—তা সত্যি কিন্তু আমার মনে হয় এ-সবের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। তুমি ইহুদীদের ইতিহাস জানো। ইহুদীরাও প্রাচীন লোক। তাদের শাস্ত্র-পুরাণ যদি আমার ঠিক স্মরণ থাকে তাহলে বলি যে তাদের জীবনে তাদের সব চেয়ে বড় বড় ব্যাপারগুলো ঘটেছিল যখন তারা হয় বন্দীত্ব বা নির্ব্বাসন-লাঞ্ছনা ভোগ করছে। যখনই তারা অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়েছে, তখনই তাদের মধ্যে প্রফেট (prophet) এসেছেন এবং যখন তাদের সব চেয়ে বড় ধর্ম্মগুরুর আবির্ভাব হ'ল সে সময় তারা রোমের শাসনের ভারে নিপীড়িত। এর মধ্যে একটা ভারী অদ্ভুত ব্যাপার আছে। লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করলে তারা রোম সম্রাটকে (acesar) কর দেবে কিনা, তখন যীশু বল্লেন—সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দিয়ে

দাও। এই কথায় তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, সামান্য মাত্র বস্তু দিয়ে, সোনা-রূপো দিয়ে, রোমকে বা শাসকদের খুশী করা সহজ, আর তাতেই বা কি আসে যায়! ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধই ত সব চেয়ে মূল্যবান আর প্রধান জিনিস।

ফ্র্যাঙ্ক বলতে লাগল—এখন আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে ভারতবাসীদের এই দিক থেকে দেখা উচিত। নিজেদের তৈরী বস্তু-তান্ত্রিকতা দিয়ে পাশ্চাত্যের বস্তু-তান্ত্রিকতা দমন করবার চেষ্টা তাদের না করাই ভাল। ভারতবাসী প্রাচ্যের লোক এবং যীশুর মতই প্রতীচ্যকে তার বলা উচিত—তুমি ত কেবল বস্তুর দাবি নিয়ে ঘুরছ, কিন্তু আমার আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আমি এত ব্যস্ত যে তোমার দিকে মনোযোগ দেবার আমার সময় নেই। পরাধীন হয়েছে বলে কারুর লজ্জিত হবার বিশেষ কারণ নেই। ভারতীয় ব্যাপারে যারা নিজেদের কেবলই নীচু করছে তারা হ'ল শাসক সম্প্রদায়। স্বাধীনতার নামে তারা একটা জাতির সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করে নিজেদের আত্মার অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করছে। বারনারী যেমন করে তার দেহ বেচে, এরা তেমনি করে স্বাধীনতার ফেরি করছে। অথচ ভারতবাসীদের ত খুব বেশী কিছু খোয়া যাচ্ছে না। তাই, যদি জেতা ও বিজিতের মধ্যে আমায় বেছে নিতে বল তবে আমি 'হারমানাদের' দলে। তাতে অন্ততঃ তোমার আত্মা কোথাও ক্ষুণ্ণ হবে না। যীশু যেমন করে রোমানদের দিয়েছিলেন, যদি পারো তবে তেমনি করে ইংরেজকে তোমার আধ্যাত্মিকতার অংশ দাও। তোমরা বিজিত বলেই আজও তোমাদের আধ্যাত্মিকতা অটুট আছে, তোমরা বিজিত না হলে এতদিন তোমরা আধ্যাত্মিকও থাকতে না।

ফ্র্যাঙ্কের এই দীর্ঘ মন্তব্য শেষ হতে আমি জেরীর দিকে চাইলুম। আমি জানতুম যে জেরী ফ্র্যাঙ্কের মত এমন সঙ্গতি রেখে ধারাবাহিকভাবে চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু তার এমন একটা মন ছিল যা বিদ্যুতের মত আকাশের বুক চিরে আপন দীপ্তিতে প্রকাশিত হ'ত।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জেরী বল্লে—তোমাদের এ সমস্তই বাজে কথা। তোমাদের দেশ স্বাধীন হতে পারে কিন্তু তাতে বোঝায় না তোমাদের আত্মাও স্বাধীন। এইসব তথাকথিত স্বাধীন দেশে লে ককে ভোটের অধিকার দেওয়া অন্ধের হাতে লণ্ঠন দেওয়ার সামিল—কি কাজে লাগবে শুনি? এ পৃথিবীতে আমরা এসেছি আমাদের এই অন্ধতা দূর করে আলো দেখব বলে। আর এই নির্ব্বোধের দল একটা ভোট দিয়ে এই জমাট অন্ধতার একটা বিশ্রী প্রহসন বানাতে চায়। আরে, অন্ধের হাতে আলো যেমন তাকে পথ দেখায় না, ভোটারের ভোটও

তেমনি মুক্তির পথের সন্ধান দেয় না। অন্ধের সঙ্গে যতই অন্ধকে বেঁধে জড়ো কর, তা দিয়ে আলোর দেখা পাবে কি! তোমার এই সব ভারতীয় লোকদের পাণ্ডিত্য খুবই চমৎকার এবং হয়ত তার দামও আছে, কিন্তু পাণ্ডিত্য সব সময়ে তরুণদের পথ ভোলায় আর তরুণরা তো ভুলতেই চায়।

লিও বল্লে—আর বুড়োরা কি করে জেরী?

জেরী বল্লে—বুড়োরা যুবাদের ফাঁকি দিয়ে খায়। পুরুষরা কাজ করে, কিন্তু মেয়েরা কাজও করে আবার সেই সঙ্গে খরচও করে। তাই দেখি প্রত্যেক মূর্খতার মধ্যে ক্রুর পরিহাস লুকিয়ে আছে আর সেই পরিহাসের মধ্যে থেকে নব নব মূর্খতা জেগে ওঠে। এই যে সমুজ্জ্বল বিরাট অন্ধকার যাকে আমরা বিশ্ব বলে গর্ব্ব করি এ তারই বর্ণনা।

আমি বল্লুম, কিন্তু—জেরী, এ সবের উত্তর কি বল?

জেরী বল্লে—এর উত্তর কোথাও না কোথাও আছে, তোমার দেশের প্রাচীন ঋষিদের মত যখন কেউ তার সন্ধান পায় তখন বুঝতে পারে যে মানুষের ভাষার মত সামান্য আধারে সে বিরাট সত্য ধরা যায় না।"

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে

শ্যামলী মুখোপাধ্যায়

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে আমি আমার শ্বশুরমশাই স্বর্গত: ডা: যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এর কাছে অনেক গল্প শুনেছি এবং তিনি যে কি পরিমাণে তাঁর এই ছোট ভাইটিকে ভালবাসতেন তার প্রমাণ পেয়েছি তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা বলার সময় তাঁর চোখ জলে ভরে যেত। আমি সেইসব শোনা ঘটনার ভিত্তিতেই এই লেখাটি রচনা করেছি।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর সময়ে সাহিত্যে এক অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র। মুখ্যত ইংরাজীতে এবং কিছু কিছু বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর বইগুলি সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছিল।

তমলুকের এক ঋদ্ধিবান কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে তাঁর জন্ম ১৮৯০ সালে। পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়, মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। তাঁরা তাদের পাঁচ পুত্র ননীগোপাল, মাখনগোপাল, ক্ষীরোদগোপাল, যাদুগোপাল ও ও ধনগোপালকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নির্ভীক দেশপ্রেমী হয়ে গড়ে উঠতে।

মাতৃমন্ত্রে তাঁর প্রথম দীক্ষা গ্রহণ হয়—যখন একজন ইংরেজ সার্জেন্ট একদল যুবককে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র মুখে উচ্চারণ করলেই বেত্রাঘাত করছিলেন এবং বেশীর ভাগ যুবক যখন বেত্রাঘাতে আহত হয়ে পিছু সরে আসতে লাগলেন তখন নির্ভিক ও দামাল ছেলে ধনগোপাল হাজার আঘাত সহ্য করেও সেই সার্জেন্ট এর মুখের উপর বন্দেমাতরম্ বলবার সাহস দেখিয়েছিলেন। বেত মেরে কি মা ভুলাবি—

আমি কি মায়ের সেই ছেলে? এটি তাঁর অন্যতম প্রিয় গান ছিল। অদম্য জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। কলেজের বন্ধ চারদেয়ালের মধ্যে বসে পড়ায় ও শিক্ষকের উপদেশে তাঁর সেই তৃষ্ণা মিটত না তাই যখন তিনি যন্ত্রবিদ্যা শিখে কলকারখানা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার জন্য জাপান যাবার সুযোগ পান সে সুযোগ গ্রহণ করতে ইতস্তত করেননি।

তাঁর অগ্রজ বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় চতুরঙ্গ সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবতেন। ছাত্র, কৃষক, মজদুর ও সৈন্য সশস্ত্র সংগ্রামে দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খলা ভাঙবে। তাই অস্ত্রশস্ত্রের রসদ সংগ্রহ করতে ও দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে বিদেশের দরবারে তুলে ধরার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রাণপ্রতিম অনুজ ধনগোপালের জাপান যাবার ইচ্ছাকে সমর্থন করেন এবং জাপান হয়ে তাঁকে আমেরিকাতে পাঠান। মায়ের আশীর্বাদ এবং সামান্য পুঁজি ভরসা করে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি পাড়ি দিলেন এক অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশ্যে। কি প্রচণ্ড মনোবল ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা মর্যাদার সঙ্গেই স্থাপনা করেছিলেন আজ ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। জাপানে কিছুদিন কাটিয়ে তিনি আমেরিকায় যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ তেমন ছিল না তাই কঠিন কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে শুরু হল জ্ঞানচর্চা সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হন এবং তারপর ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট থীসিস রচনা করতে বসেন।

মূলতঃ নিউইয়র্কবাসী হলেও পরিব্রাজকরূপে সারা আমেরিকা ঘুরে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন ভারতমায়ের এই দুর্দান্ত দামাল ছেলে, কাজ করেছেন দেশের বে-সরকারী cultural Ambassader-এর ভারতকে হেয় করতে মিস্ মেয়ো লিখলেন "Mother India"—তথ্য ও অকাট্য যুক্তি দিয়ে মিস্ মেয়োর বক্তব্য খণ্ডন করলেন ধনগোপাল "A Son of Mother India Answers"—বইটিতে। এরপর তাঁর আর একটি সাড়া জাগানো বই প্রকাশ পেলো "Visit India with me"—উদ্ধত পাশ্চত্যবাসীকে এক দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জ। এরপর তিনি একের পর এক বই লিখে যান বিশেষ করে শিশুদের জন্য। তাঁর একাধিক বই বিদেশে সমাদৃত হয়েছে এবং ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Kari the Elephant (1923) Cast and outcast (1923) My Brothers face (1924) Face of Silence (1926) Gay neck (1928) Chief of Herd (1929) Visit India with me (1929) Songs of

God (1931) তাঁর Gay neck বইটি তাঁকে "John Newbery Medel"—পুরস্কার এনে দেয় সে সময়ের শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্য রচনার জন্য। তাঁর অগ্রজ ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর জীবনী তাঁর লেখা My brothers face—বইটি সেই সময় চেক, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান ফ্রেমিশ জার্মান ও আরো বহু ভাষায় অনুদিত হয়। যার ফলে পাশ্চাত্য জগত ভারতের এই মুক্তি আন্দোলনের কথা জানতে পারে। তাঁর লেখা এই বইটি পড়লে বোঝা যায় অগ্রজের প্রতি কি অসীম ভক্তি ছিল। তাঁর প্রতিটি চিঠির শেষে লেখা থাকতো—"দাস ধনগোপাল—"

তাঁর লেখা অনেক বই আমেরিকাতে best seller হয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়াতে খ্যাতিলাভ করেছে এবং তাঁর একাধিক বই চেক ইটালীয়ান ফ্রেঞ্চ ফ্রেমিশ, জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

মাত্র ৪৫ বছরের তাঁর সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালের ১৯ বছর কেটেছে ভারতবর্ষে। পরের ২৬ বছর বিদেশে। তার মধ্যে কয়েকবারই ভারতে এসে উঠেছেন বেলুড় মঠে এবং "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"র রচয়িতা শ্রী"ম"র পরামর্শে দক্ষিণেশ্বরের বহু জনের কাছে গিয়ে উদ্ধার করেছিলেন বহু অজ্ঞাত তথ্য এবং তারপর তিনি লেখেন "Face of Silence"—রোঁমা রোঁলার বোন তাঁকে ইংরাজী থেকে ফ্রেঞ্চে অনুবাদ করে বইটি পড়ে শোনান, তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি ধনগোপালকে লেখেন মিঃ মুখার্জী "আমি কি ভাবে আপনাকে পাশ্চাত্যের পাঠকের কাছে পরিচয় করিয়ে দেব?" তার উত্তরে ধনগোপাল লেখেন "আমাকে নয় অনুগ্রহ করে আমার প্রভুর কথা প্রচার করুন—(এই কথাটি আমি একাধিকবার আমার শ্বশুরমশাই-এর মুখে শুনেছি)

তারপরই রোঁমা রোঁলা লেখেন "The life of Sri Ramakrishna"—এই বইটির মুখবন্ধে তিনি স্বীকার করেছেন যে ধনগোপাল মুখার্জীর লেখা পড়েই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতে পারেন। তিনি ইংল্যাণ্ডেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সভায় বক্তৃতা দিয়ে সেখানকার যে সকল বিখ্যাত মণীষীদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বার্নাড শ, বারট্রাণ্ডরাসেল, এইচ-জি ওয়েলস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকাতে তাঁর বাড়ীতেই ছিলেন নরেন ভট্টাচার্য্য। তাঁর মানবেন্দ্রনাথ রায় (M. N. Roy) নামটি ধনগোপালেরই দেওয়া। এক চেকোশ্লাভাকিয়ান ভদ্রলোক মিঃ এ্যাণ্টনী সেডিল্যাককে লেখা বাবার চিঠির অনুলিপি থেকে জানতে পারি—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ভারতে প্রচুর বিপ্লবীদের ধর পাকড় ও ফাঁসি দেওয়া

হচ্ছিল সেই সময় নিউইয়র্কে ধনগোপালের ফ্ল্যাটেও অনুসন্ধান চালান হয় তবে স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। জওহরলাল নেহেরু তার এই সমবয়সী বন্ধুটির সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করতেন—সেই চিঠিগুলির অনুবাদ "জয়শ্রী" ১৩৯১ ভাদ্রর সংখ্যাতে প্যারিসপ্রবাসী সুসাহিত্যিক পৃথ্বিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেছেন। এছাড়া letter from a father to his daughter"—ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রকাশনার ভার ধনগোপালকে দিয়েছিলেন জওহরলাল। ফ্রান্সে থাকাকালীন নেহেরুর কন্যা ইন্দিরার অভিভাবকও ছিলেন ধনগোপাল। ধনগোপাল তাঁর একমাত্র পুত্র গোপাল ও ইন্দিরাকে জেনিভায় একই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। আমেরিকাতে সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতাসফরের ব্যবস্থার ভারও তাঁর উপর দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর পারিবারিক জীবনের কথা বলতে গেলে তাঁর মার্কিনী স্ত্রী ETHEL DUGAN-এর কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ETHEL DUGAN ছিলেন শান্ত নিরভিমানিনী। তিনিও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট এবং শিক্ষিকা ছিলেন। সর্বদা স্বামীর পাশে থেকে তাঁর লেখায় সাহায্য ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ছিলেন। তাঁদের একমাত্র ছেলের নাম রেখেছিলেন নরেন্দ্র গোপাল। তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। পিতার মৃত্যুর পর সে তার নাম পিতার নাম অনুসারে জুনিয়ার ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রাখেন। এবং নিজগুণে তিনি পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হন। প্যান আমেরিকান এয়ার ওয়েজ-এর ডিরেকটর ছিলেন। আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স এর ডিরেকটর এবং ই. এফ্. ম্যাকডোনাল্ড কোর প্রেসিডেন্টেরপদও জুনিয়ার ধনগোপাল অলঙ্কৃত করেন। তাঁর আর একজন গুণ-মুগ্ধ ভারতপ্রেমী বন্ধু প্রঃ ইয়ানিচেক এখনও জীবিত আছেন চেকোস্লোভাকিয়াতে, যাঁর কাছে তাঁর লেখা প্রচুর চিঠি ও বই আছে এবং তিনি নিজে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বেশীর ভাগ বই চেক ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এছাড়া হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে তাঁর লেখা নিম্নলিখিত বইগুলি এখনও দেখতে পাওয়া যায়—

Cat. no		
Ind 2012. No 5	(1)	cast and outcast
Phil 8887.72	(2)	Daily meditation or the practice of repose
Ind 2062.77	(3)	The face of silence
Al 2489.4.82	(4)	Gay neck

AL 2484.4.83	(5)	Hari the jungle lad
DA 459.12.2	(6)	The Judgement of Indra—A play.
AL 2459.4.9.65	(7)	Jungle beasts and men
AL 2489. 4.94.10	(8)	Kari the Elephant.
DAL 2489. 4.85	(9)	Layla Majnu.
Ind 2012.67	(10)	My brother's face.
AL 2487.490	(11)	Sandhya songs of Twilight.
Al 2489 4.92	(12)	The secret listeners of the east.
Ind 200927.20	(13)	A son of mother India Answers.
Ind 3313.25.27	(14)	Bhagabat Gita.

সংক্ষিপ্তসারে বলতে গেলে তিনি ছিলেন সু-সাহিত্যিক, দার্শনিক। কিন্তু তাঁর ভাবালুতার ও স্বপ্নালুতার সঙ্গে বাস্তব বুদ্ধির এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ছিল। সংস্কার-মুক্ত, কিন্তু নাস্তিক নন, অধ্যাত্মবাদী। রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সংগ্রামী অথচ কবি। বিদ্রোহী কিন্তু কি প্রচণ্ড বিনয়ী! বেলুড়মঠে কাটাতেন খালি পায়ে খালি গায়ে। পরস্পর বিরোধী বহু গুণের এবং শৌর্য্যের সঙ্গে সাহিত্যের মাধুর্যের এক অদ্ভুত সহাবস্থান ঘটেছিল ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জীবনে।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মূল ইংরাজী রচনা : 'cast and cutcaat' থেকে অনুবাদ : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ঘরের ছেলে বাহিরে' বহুবছর আগে এম, সি, সরকার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বিভাবে প্রকাশিত অংশটুকুর পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন বইটির প্রকাশক শ্রদ্ধেয় সুপ্রিয় সরকার। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের হস্তলিপি পেয়েছি তাঁর দাদা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ডাঃ সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

—সম্পাদক

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বহু বিতর্কিত আত্মহনন প্রসঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের সংযোজন :

গত ২৭শে জুলাই '৮৬

'দি স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌'-এর ক্রোড়পত্রে শ্রীসমরেশ রায়ের লেখা A revolutionary writer পড়লাম। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে এক জায়গায় সমরেশ রায় লিখেছেন যে 'Some believed his suicide was caused by proverty.' অনেক ভেবে মনে হচ্ছে কথাটা ঠিক নয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে এত ছোট বয়স থেকে যুদ্ধ করেছেন যে পরিণত বয়সে তার জন্যই আত্মহত্যা করবেন মনে হয় না। সে সময়ের চিঠি থেকে জানতে পারছি যে উনি ভারতবর্ষে অনেককে টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনেও টাকা পাঠাতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার বাবা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর (ধনগোপালের) স্ত্রীকে আমাদের প্রথা অনুযায়ী টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কাকীমা সে টাকা গ্রহণ করেননি। তিনি স্কুলে পড়াতেন এবং যে টাকা পেতেন তা তাঁর নিজের এবং ছেলের জন্য যথেষ্ট ছিল। এর পরেও ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছিলেন এবং বইয়ের রয়্যালটিও যথেষ্ট ছিল। আমি এই ব্যাপারে পরে আপনাকে আরও জানাব। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের হাতের লেখা ভাল ছিল না। আমি তাঁর চিঠির একাংশের xerox করে পাঠালাম।"

ডাঃ সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

আজ ঐতিহাসিক মে দিবসের শতবর্ষ

আজ থেকে একশ বছর আগে ১৮৮৬-র পয়লা মে শনিবার ধনবাদী সভ্যতার অবারিত শোষণের প্রতিবাদে এবং আট ঘণ্টার বেশি ফ্যাক্টরিতে না-খাটার দাবীতে শিকাগোর ৫০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট ঘোষণা করেন আর মিছিলে যোগ দেন অযুত শ্রমিক! ধর্মঘট-ভাঙা দালাল দিয়ে ম্যাক্‌কর্ণিক ফ্যাক্টরি চালু রাখার চেষ্টায় বাধা দিলে ৩ মে একজন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে মারা যান। ৪ মে হে মার্কেটের প্রতিবাদ সভায় প্রায় মধ্যরাতের চোরা আক্রমণে একজন শ্রমিক মারা যান পুলিশের গুলিতে। আর নিহত হন পুলিশ অফিসার দেগান। শহরে নিষিদ্ধ হয়ে যায় জনসভা। সিটি কাউন্সিল হুকুম জারী করে, শিকাগোর পথঘাট থেকে লাল রঙ, যা শ্রমিক আন্দোলনের রঙ, পুরোপুরি মুছে দিতে। শহর জুড়ে পুলিশি ধরপাকড়ের তাণ্ডব। দেগানের হত্যাকারী হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ৮ জন শ্রমিক নেতাকে! চারজনকে ঝোলানো হয় ফাঁসীকাঠে। দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। একজনের পনের বছরের জেল। একজন ফাঁসীর আগের দিন আত্মহত্যা করেন পুলিশি অত্যাচারে।

এমন উলঙ্গ বর্বরতাতেও শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থানকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না পৃথিবীর কোন দেশেই। নিছক উৎপাদক শক্তি থেকে তার উত্তরণ ঘটলো জাতির ভাগ্য-নির্ধারকে। আজ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ দেশে শ্রমিকরাজ। সমগ্র জনসংখ্যার ছ' ভাগের এক ভাগ মানুষ বাস করেন সমাজতন্ত্রে।

পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী অভিনন্দন

পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক শ্রেণীর এই প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে যতখানি সচেতন, নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ও জীবনযাপনের মানোন্নয়নে ততখানিই বদ্ধপরিকর। বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বাস করে শ্রমিক শ্রেণীকে অন্ধকারে রেখে দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব নয়।

আই সি এ ২৩৬৮/৮৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মঞ্জুষা

গৃহসজ্জায় ও প্রীতিউপহারে
বাংলার নিজস্ব হস্তশিল্প

পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন)
৭/১ডি, লিণ্ডসে স্ট্রীট কলিকাতা - ১৬

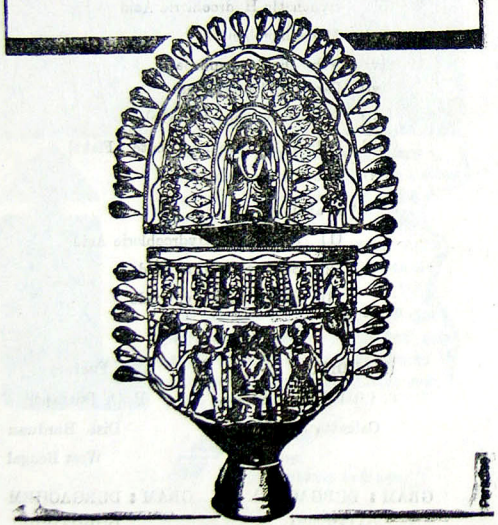

শো রুম : ৭/১ ডি লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা। এ-২, স্টেট এম্পোরিয়াম বিল্ডিং, নিউ দিল্লী। ৮৩, এম জি রোড, ব্যাঙ্গালোর। এম আই রোড ও সুভাষ মার্গের সংযোগস্থল, জয়পুর। ১৭ নেহেরু রোড, দার্জিলিং। কুলপী রোড, বারুইপুর।

প্রবন্ধ

কবি ও সন্ন্যাসী

রবীন্দ্র জীবনার খসড়া

শিশিরকুমার দাশ

১

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী'র নায়ক এক কবি। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর থেকে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যে দেখি বারবার একটি কবির কথা ঘুরে ফিরে আসে। এরা কি একই চরিত্র, না একই চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপ? একটি চরিত্রেরই বিবর্তন চলেছে কি রবীন্দ্রনাথের মনে? না, এরা সব ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র, ভিন্ন ভিন্ন কালে রবীন্দ্রনাথ তাদের সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর যদি পাওয়া যায় তাহলে হয়তো রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলবেন যথার্থ কবিজীবনী, তার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব রবীন্দ্রনাথ হয়তো অগোচরেই তাঁর কাব্যজীবনেরই বিবর্তনের একটি ইতিহাস রচনা করে চলেছেন তাঁর সৃষ্টির পাশাপাশি। আর যদি এই কবি চরিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের কোনো সম্পর্ক নাও থাকে, তাহলেও আমাদের জানতে হবে কেন একটি বিশেষ চরিত্রের প্রতি তাঁর এই বিশেষ আকর্ষণ? তিনি কি এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে এমন কথা বলতে চাইছেন যা তাঁর পক্ষে অন্যভাবে বলা সম্ভব ছিলনা, বা তাঁর আয়ত্তের বাইরে ছিল? অথবা তিনি কি এইসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে বলতে চাইছিলেন তাঁর কবিতার জগতের, তাঁর কবি আদর্শের কথা?

'কবিকাহিনী'র কবি সম্বন্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে যে মন্তব্য করেছেন তাতে আমাদের প্রশ্নের কিছুটা উত্তর মেলে। "যে বয়সে লেখক

জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে—লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে, যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হ্যাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি।" রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, বিশেষ করে 'কবিকাহিনী' পড়ার পর মনে হয় এইটিই একমাত্র ব্যাখ্যা। কিন্তু এই কবি তো শুধু 'কবিকাহিনী'তে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়নি। একটি কবির চরিত্র বারবার তাঁর সাহিত্যে, কবিতায়, নাটকে, গল্পে, দেখা দিচ্ছে। একটা কথা মানতেই হবে যে একটি চরিত্র বা একটি বিষয় যখন একজন লেখকের লেখায় বারবার ঘুরে ঘুরে আসে, তখন নিশ্চয়ই সেই চরিত্র বা বিষয় লেখকের মনের গভীরে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। বিষয়টা তাঁকে এমনভাবে নাড়া দেয়, যে সেই কথাটা তিনি নানারূপে বলতে চান। আজকের দিনের পাঠক যখন 'কবিকাহিনী' পড়েন, তিনি অবশ্যই তার কবিত্বে অভিভূত হননা। কিন্তু তিনি স্বীকার করবেন যে রবীন্দ্রকাব্যের ক্ষীণ নির্ঝর এখানে স্পষ্টভাবেই দেখা দিয়েছে, আর তার একটি কারণ ঐ কবি চরিত্র। এখানে আছে এক কবির বাল্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী জীবনের কথা। দীর্ঘকালব্যাপী জীবন, কিন্তু ঘটনা বা অভিজ্ঞতার দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষীণ জীবন। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন এ সেই বয়স যখন তিনি জগতকে চেনেননা, নিজের "অপরিস্ফুট ছায়ামূর্তি"ই এখানে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। এই ছায়ামূর্তির একটি কায়া-সহচর কি নেই কোথাও? 'কবিকাহিনী'র নায়ক যে কবি সে অবশ্যই কল্পনার সৃষ্টি, বস্তুত সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্টি বলেই এমন নিরাবয়ব, কোথাও বাস্তব অভিজ্ঞতার মিশাল হয়নি বলেই এমন নীরক্ত। কিন্তু সেই সৃষ্টির পেছনে যে মনটি কাজ করছিল তার প্রকৃতিও পাঠকের কাছে অস্পষ্ট থাকেনা।

'কবিকাহিনী'র নায়কের সমস্ত সত্তায় ছিল একাকিত্বের বোধ। "একাকী আপন মনে সরল শিশুটি / তোমারি কমল বনে করিত গো খেলা", "একাকী আপন মনে কাননে কাননে", "দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়"। এই একাকিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রকৃতিপ্রীতি। যৌবনে এই দুই মিলে তাকে কবি করে গড়েছিল, "বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা"। এই কবিকে সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্টি বলে কেউ

কেউ মানতে নাও পারেন, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনকে খুঁজে নিতে চাইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এই সৃষ্টির মধ্যে বাস্তব যেটুকু তা রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়, কবি ও কবিতা সম্বন্ধে তাঁর কৈশোরের বিশেষ ধারণা, যে কথা 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। যদিও এই কবির ভাবাকুলতা রবীন্দ্রনাথের ভাবাকুলতা থেকে অভিন্ন।

কবিত্বের শক্তি অর্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কবির মধ্যে এসেছিল প্রকাশের দুরন্ত তীব্রতা এবং তীব্র অসন্তোষ ও শূন্যতা। এক উদাসী যোগী কবিকে বলেছিলেন "মানুষের মন চায় মানুষেরই মন"। কবি এক মনের মানুষকে পেয়েছিল অল্প সময়ের জন্য— নলিনীকে। কিন্তু তার নিজের আত্মসংক্ষোভ ও অস্থিরতায় সে হারাল নলিনীকে। তারপর দ্রুতগতিতে পট পরিবর্তন হয় কাহিনীর। বৃদ্ধ কবিকে আমরা দেখি, যার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে মানুষের ইতিহাসের "রক্তপাত অত্যাচার, পাপ, কোলাহল", যে স্বপ্ন দেখে শোষণহীন এক সমাজের, মানুষের মুক্তির। সেই মুক্তির স্বপ্ন দেখতে দেখতে কবির মৃত্যু হয়। মানুষের জন্য করুণায় এই কবির অবসান।

২

এই অপরিস্ফুট ছায়ামূর্তি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করে আছে। রবীন্দ্রনাথও সক্ষম নন ঐ ছায়ামূর্তি থেকে সরে আসতে। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যেও এসে দেখা দেন ঐ একই কবি। তাঁকে দেখে মনে হয় "জীবন্ত স্বপ্ন", "মূর্তিমান ভাবনা" (আমরা শুনতে পাই শেলীর প্রতিধ্বনি : Like a poet hidden in the light of thought)। 'কবিকাহিনী'র নায়কের মতো তাঁরও হৃদয় "অশান্তির আলয়", তাঁর একাকিত্বের বোধ তীব্র, যদিও তিনি 'কবিকাহিনী'র নায়কের মতো একা নন। তাঁরও হৃদয় সমুদ্রের মত উদ্বেল :

হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত।...
সে সিন্ধু হৃদয়ে
দুরন্ত শিশুর মত মুক্ত সমীরণ
হু হু করি দিবানিশি বেড়াত খেলিয়া। (কবিকাহিনী)

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ মাঝারে
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে। (ভগ্নহৃদয়)

'ভগ্নহৃদয়ে'র কবি ভালোবাসে নলিনীকে। এই নলিনী 'কবিকাহিনী'র সরলা বালিকা মাত্র নয়। কবির প্রতি তার যথার্থ ভালোবাসা নেই, ছলনা আছে। কারণ নলিনী বোঝে যেন কবিরা ভালোবাসে তাদের কল্পনার নারীকে, রক্ত-মাংসের নারীকে নয়। প্রাত্যহিকের নৈকট্যে যেই কল্পনার নারী তার দেবীর জ্যোতি হারিয়ে সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠে, তখনই কবি হাহাকার করে ওঠে। 'কবিকাহিনী'র নলিনীরই অভিজ্ঞরূপ 'ভগ্নহৃদয়ে'র নলিনী, অথবা এই নলিনী ওই নলিনীর অভিজ্ঞতার উপাদানে গড়া। 'কবিকাহিনী'র কবির চেয়ে 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবির অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে জটিল। সে প্রেমের ছলনা থেকে আঘাত পেয়েছে, সে প্রেমের একনিষ্ঠতাকে চিনতে পেরে নূতন অভিজ্ঞতা পেয়েছে, শেষ পর্যন্ত পেয়েছে জীবনের কাছ থেকে আঘাত— মুরলার মৃত্যুতে। 'কবি-কাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবি মূলত এক, যদিও তাদের মধ্যে ক্ষীণ বিকাশ আছে। দুটিই অপরিস্ফুট ছায়ামূর্তি এবং এদের কায়াগত ভিত্তিও ক্ষীণ। কিন্তু দুই কবির জীবন এদের স্রষ্টার মনোজীবনেরই প্রতিফলন, এদের বাইরের জীবনের সঙ্গে নয়, এদের বাইরের জীবনের ঘটনা নিতান্তই সামান্য এবং প্রবল কল্পনা বাষ্পাচ্ছন্ন, এদের অন্তর্জীবনের সঙ্গে যোগ রবীন্দ্রনাথেরই। এই কাব্য থেকে যে স্রষ্টার মনকে আমরা জানি সে মন এই কাব্যের নায়কের মনের সঙ্গে সম্পূর্ণ-ভাবেই একাত্ম। আবেগ উন্মথিত, প্রকাশের শক্তিতে মোহিত কিন্তু এখনও প্রকাশে অসমর্থ, জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাহীন, কল্পিত দুঃখ ও বিচ্ছেদ-তাড়িত, আত্মকেন্দ্রিক অথচ আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে উত্তীর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষায় কখনও উদ্বেলিত এক কবিকেই পাই দুই কাব্যে। সেই কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এই দুই কাব্যের অপরিস্ফুট কবি, অপরিস্ফুট রবীন্দ্রনাথ।

৩

'রুদ্রচণ্ড' নাটকেও আবার এক কবির আবির্ভাব। আগের দুই কবি নামহীন, অবয়বহীন, অনির্দিষ্ট। 'রুদ্রচণ্ডে'র কবি নির্দিষ্ট, তুলনামূলকভাবে, স্পষ্ট ও অবয়ব সম্পন্ন। 'রুদ্রচণ্ডে'র চাঁদকবি ইতিহাসের চরিত্রও বটে। তার অবয় তার স্পষ্টতার জন্য কিছুটা দায়ী তার ইতিহাসের পরিচয়, সেইসঙ্গে তার স্পষ্টতার আর একটি কারণ তার আচরণ। এখানেও কি রবীন্দ্রনাথ সন্ধান করছেন 'লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে', সেইরকম চরিত্র, সেইরকম আদর্শ? চাঁদকবিও ভাবাকুল, কিন্তু 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবির মতোই

শুধু ভাববাষ্পে সমাচ্ছন্ন নয়। সে বীর, সে কর্মী। তার ভালোবাসার কথা আছে এই কাব্যে। কিন্তু এই ভালোবাসা প্রেমিকের নয়। অমিয়া ও চাঁদের ভালোবাসা ভাইবোনের। কিন্তু এই মানবসম্পর্কের বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্রচণ্ডের তীব্র দৈহিক শক্তি, পৃথ্বীরাজের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা। চাঁদকবি অন্য কবিদের মতোই ভগ্নহৃদয়, কারণ অমিয়া শেষ পর্যন্ত মারা যায়। ভগ্নহৃদয় কারণ পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে পরাজিত হয়, যদিও অন্য কবিদুটির বেদনার পেছনে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা ছাড়া আর কোনো বৃহত্তর সামাজিক কারণ নেই। চাঁদকবি তাই স্পষ্টতই অন্য দুই কবি থেকে পৃথক।

একদিকে অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এক কবি, অন্যদিকে স্পষ্ট, ঐতিহাসিক এক কবি— এই দুই কবির দুটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হল রবীন্দ্র-সাহিত্যে। প্রথম ধারার কবি চিরকালই এমন থাকবে না, বিবর্তিত হবে, ভাবাকুলতার কুয়াশা আস্তে আস্তে কাটবে, ফুটে উঠবে তাদের কঠিন মূর্তি। ঐতিহাসিক কবিও বিবর্তিত হবে, অনেক সময়ই সে কবি মিলে যাবে প্রথম ধারার কবির সঙ্গে, অনেক সময়ই তার মিল দেখতে পাব রবীন্দ্র-কল্পিত কবির সঙ্গে। কিন্তু তবু তারা এক নয়, তারা ভিন্ন চরিত্র। প্রথমটির জন্ম কল্পনায়, রবীন্দ্র-কবিস্বভাবই তার গঠনের মৌল উপাদান। দ্বিতীয়টির উৎস ইতিহাসে, লোককথায়, কিন্তু তার চরিত্রায়ণ রবীন্দ্রনাথের। প্রথম ধারার উৎসে আছে 'কবিকাহিনী'র নায়ক, দ্বিতীয় ধারার উৎসে 'রুদ্রচণ্ডে'র চাঁদ-কবি। প্রথম ধারার স্রোতপথে দেখা দেবে 'সোনার তরী'র "পুরস্কার" কবিতার নামহীন এক কবি, "জয়পরাজয়" গল্পের শেখর, 'বসন্তে'র কবি, 'ফাল্গুনী'র কবি, 'ঋণশোধে'র কবি এবং 'রথের রশি'র কবি। দ্বিতীয় ধারার স্রোতপথে দেখা দেবেন সুরদাস, কালিদাস এবং বাল্মীকি।

৪

আমরা প্রথমে দেখি এই দুই ধারার সমান্তরাল গতি। 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্ন-হৃদয়ে'র কবি আত্মকেন্দ্রিক, তাদের জীবনের সংঘাত নেই, আছে মনের সংক্ষোভ। চাঁদকবির জীবনে আছে সংঘাত, একদিকে রুদ্রচণ্ডের সঙ্গে, অন্যদিকে পৃথ্বীরাজের অন্যান্য শত্রুদের সঙ্গে। চাঁদকবির সঙ্গে 'কবিকাহিনী'র পার্থক্য কর্তব্যবোধে। 'কবিকাহিনী'র কবির আত্মকেন্দ্রিকতা তাকে কোনো কর্তব্যের নামে চালিত করেনি। চাঁদকবির কর্তব্য স্পষ্ট। "দুয়ারে এসেছে শত্রু, বিলম্ব সহে না / দাও মোরে বর্ম দাও, অশ্ব লয়ে এস / ত্বরা কর, বাজাও বাজাও রণভেরী।" কিন্তু

ইতিহাসের কবি ও কল্পনার কবির গভীর যোগ আছে এক জায়গায়। দুই কবির মধ্যে আছে বিষণ্ণতা ও ব্যর্থতার বোধ। ইতিহাসের কবির ব্যর্থতার বোধের বস্তুভিত্তি অবশ্য বেশি প্রত্যক্ষ। পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের মধ্যে তার ভবিষ্যৎ কর্তব্যের আভাসও আছে। পৃথ্বীরাজকে সে অমর করে রাখবে কাব্যে— "এই এক ব্রত শুধু রহিল আমার।" অমিয়ার সঙ্গেও তার সম্পর্ক স্পষ্ট, তার মৃত্যুতে চাঁদ-কবির বেদনার বোধ তীব্র ও গভীর, কিন্তু কখনই নিতান্ত ভাবাকুলতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না।

চাঁদকবির পরেই রবীন্দ্র-কাব্যে আর এক কবি দেখা দেন 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য়। এই কবির সঙ্গে যেমন চাঁদকবিরও মিল নেই, তেমনই মিল নেই 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবির। বাল্মীকির জীবন হিংস্রতার, হত্যার, দস্যুতার। কিন্তু হঠাৎ যেদিন অরণ্যে বালিকাকে বলি দেবার আগে বালিকার গান শুনে তার মনের মধ্যে পরিবর্তন আসে, তখন থেকেই তার সঙ্গে আন্তর মিল খুঁজে পাই প্রথম ধারার কবির সঙ্গে। বাল্মীকির গানে

কে পুরাবে মোর শূন্য এ হিয়া
জুড়াবে প্রাণ সুধা বরষণে

জীবনে কিছু হল না হায়
গহনে গহনে কত ভ্রমিব নিরাশার এ আঁধারে
শূন্য হৃদয় আর বহিতে পারিনা যে।

'কবিকাহিনী'র কবির বিলাপেরই প্রতিধ্বনি শুনি :

নদ-নদী গিরিগুহা কত দেখিলাম তবু
প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না দেবি।

প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না বালা
এখনো বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য
সে শূন্য কি এ জনমে পুরিবেনা আর।

'কবিকাহিনী'র কবি বার্ধক্যে পৃথিবীর দুঃখে করুণায় ভরে উঠেছিল। তার সেই বেদনাঘন মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমান সংগ্রহ করেছিলেন বাল্মীকির জীবন থেকেই

মিলি তাঁর সাথে
জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী
কাঁদিলেন আর্দ্র হয়ে পৃথিবীর দুখে
ব্যাধ শরে নিপতিত পাখীর মরণে
বাল্মীকির সাথে যিনি করেন রোদন।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বাল্মীকির কবিত্বের উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ চালিত হয়েছেন প্রচলিত কাহিনীর দ্বারা। ক্রৌঞ্চ মিথুনের মৃত্যুতে শোকার্ত বাল্মীকির কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছে শ্লোক। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথ যোগ করেছেন একটি বিশেষ মাত্রা। সেই মাত্রা অবশ্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বাল্মীকিতে নয়, অনেক পরে লেখা "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন প্রতিভার একটি বিশেষ অস্থিরতা। "ভাষা ও ছন্দে"র মধ্যে যে বাল্মীকিকে আমরা পাই তিনি 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বাল্মীকির মতো কারুণ্যের ভাবমূর্তি নন, তিনি এক প্রচণ্ড শক্তির তাড়নায় উদ্বেল

তরুণ গরুড় সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা।

তরুণ গরুড়ের এই প্রতিমা কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রথম দেখা দিয়েছিল 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যে, আর সে-ও কবিপ্রতিভার এই অস্থিরতার প্রসঙ্গে।

নবজাত উল্কানেত্র মহাপক্ষ গরুড় যেমন
বসিতে না পায় ঠাঁই চরাচর করিয়া ভ্রমণ।

প্রকৃতপক্ষে 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবির যে বেদনা, যে অস্থিরতা তা রূপান্তরিত হয়েছে "ভাষা ও ছন্দ"-এর বাল্মীকির বেদনায়। এই দুই কবি প্রতিভায় সমতুল্য কিনা সে প্রশ্ন বড়ো নয়, এদের উভয়ের ঐক্য কবিপ্রকৃতিতে। অপরিণত ও অপরিস্ফুট কবি চরিত্র এখানে পরিণতি পেয়েছে, পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন, তার পক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ, অগ্নি সম দেবতার দান
ঊর্ধ্ব শিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

এই অলৌকিক আনন্দ ও অপার বেদনা নেই 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বাল্মীকিতে। "ভাষা ও ছন্দ"-এর বাল্মীকি তাই ইতিহাসের কবির চরিত্রায়ণ মাত্র নয়, এই কবি রবীন্দ্র-কাব্যের সেই নামহীন কবিরই একটি পরিণত মূর্তি। কল্পনার আদর্শ কবি বা

কবিপ্রকৃতির আদর্শ এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে ইতিহাসের কবি চরিত্রকে আশ্রয় করে।

৫

চাঁদকবি ও বাল্মীকির পরে ইতিহাসের আর একজন কবিকে পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'তে। তিনি সুরদাস। এই কবি চরিত্রটি স্মরণীয় শুধু এইজন্য যে এখানে এমন একটি সংঘাতের কথা বলা হয়েছে যার কথা রবীন্দ্র-কাব্যে আগে ছিলনা এবং পরেও দেখবনা, অন্তত এইরূপে দেখবনা। এতদিন পর্যন্ত যেসব কবির কথা শুনেছি রবীন্দ্র-কাব্যে তাদের চরিত্রে উদ্বেলতা আছে, কিন্তু যথার্থ কোনো সংঘাত নেই। এখানে কবির মধ্যে দেখা দিল একটি তীব্র দ্বন্দ্ব, আর সেই দ্বন্দ্বের প্রকৃতি এমন যাতে কবিত্বের যে আদর্শ ফুটে উঠছিল রবীন্দ্র-কাব্যে, তার বিরোধী একটা শক্তিকেই আমরা দেখতে পাই। প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করেছি 'কবিকাহিনী'র নায়কের। প্রকৃতির উদ্দেশ্যে 'কবিকাহিনী'র নায়ক বলেছিল

হে মহাপ্রকৃতি
কি সুন্দর কি মহান মুখশ্রী তোমার
শূন্য আকাশের পটে হে প্রকৃতি দেবি
কি কবিতা লিখেছ যে জলন্ত অক্ষরে।

সুরদাস সেই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বলেছে "মাধুরী মদিরা"। প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ তাকে করেছে ইন্দ্রিয়াতুর। আর সেই আকর্ষণ থেকেই শেষ পর্যন্ত তার মনে জন্ম নিয়েছে পাপবোধ। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস বা কিংবদন্তী থেকে সুরদাসের অন্ধত্বের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সে প্রসঙ্গ অবান্তর। যেটি লক্ষণীয়, সেটি হল সুরদাসের রূপবোধ ও পাপবোধ ইন্দ্রিয়াতুরতা ও ইন্দ্রিয়-জয়ের সংগ্রামের সংকল্প, এই বিরোধী বোধ ও ইচ্ছার সংগ্রাম। আর সেটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। সোফোক্লেসের ওইদিপৌস যখন তরবারি দিয়ে তার চোখ দুটি বিদ্ধ করেছিল তখন তার যুক্তি ছিল ওই চোখে পৃথিবীর দিকে, তার ভ্রাতা-সন্তানদের দিকে সে আর তাকাতে পারবেনা। পাপবোধ তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল অন্ধত্ব-স্বীকারে। পারলে সে অন্য ইন্দ্রিয়গুলির পথও রুদ্ধ করত। কিন্তু মৃত্যু সে চায়নি কারণ যন্ত্রণার অবসানও সে চায়নি। সুরদাস বিশেষ করে বিদ্ধ করতে চায় তার চোখ, অন্য ইন্দ্রিয়গুলি নয়; কারণ, "তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার সে আঁখি তোমারি হোক।"

আমরা প্রশ্ন করতে পারি সুরদাসের মনে এই পাপবোধ কেন? প্রকৃতির সৌন্দর্যকে এই ধিক্কার কেন? রবীন্দ্রনাথের চোখে প্রকৃতি কি তাহলে মোহিনী-মাত্র, যে মানুষকে তার কর্তব্য ভোলায়, তাকে ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস করে? এই কবিতায় সুরদাসের কথা থেকে জানতে পারি যে সে একজন নারীকে কামনা করেছিল যে নারীকে তার কামনা করা অনুচিত। ওইদিপৌস যে নারীর শয্যাকে কলঙ্কিত করেছিল সে নারী তার জননী। ওইদিপৌসের অপরাধ অজ্ঞানতাজনিত। সুরদাসের অপরাধ সচেতন অপরাধ, কিন্তু তার পেছনে ছিল প্রকৃতির প্ররোচনা। প্রকৃতি তাকে মুগ্ধ করেছে তার রূপে, নারীও সেই রূপেরই অন্তর্গত। তবে একটি বিশেষ নারীর কথাই বলা হয়েছে এখানে, যে নারী তার কামনার অধীন হতে পারে-না। তাই সেই নারীর উদ্দেশেই সুরদাসের কাতরোক্তি।

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন এ কালো নয়ন মম।

যৌনতাভিত্তিক যে ভালোবাসা তাকে সুরদাস উত্তীর্ণ করতে চান দেহহীন প্রেমে। "তোমাতে হেরিব আমার দেবতা / হেরিব আমার হরি / তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী"। কিন্তু সুরদাসের প্রার্থনায় আমাদের যা আকর্ষণ করে তা কি তার ইন্দ্রিয়পথরোধকারী প্রেম? না, তার অন্তর্দহন? পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়াতীতের দ্বন্দ্ব? সেই দ্বন্দ্বের সমাধান সুরদাসের জীবনে হতেও পারে, কিন্তু এই কবিতায় সেই সমাধানের শান্তি নেই, আছে দহনের জ্বালা। যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলবেন ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে সাধনার পথ তার নয়, সে রবীন্দ্রনাথ কি এখনও অনাগত? না, সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই সংগ্রাম চলেছে অন্য কোনো আদর্শের? এর পরেও আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথ চাইছেন ইন্দ্রিয়ের জগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত জগতকে মেলাতে, কিন্তু সেই জগতের একটিকে অস্বীকার করে নয়। পরে রবীন্দ্রনাথ বলবেন যে ঈশ্বরকে তিনি বিশ্বাস করেন তিনি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে উদ্ভাসিত। "সুরদাসের প্রার্থনা" কি তাহলে সেই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বিরোধী? সুরদাস যদি কবি হন, তাহলে রবীন্দ্রনাথ যে কবির কথা ভাবছেন, যে কবিকে তিনি সৃষ্টি করছেন কাব্যে এবং যে কবি হতে চাইছেন নিজের জীবনে, সুরদাস তার থেকে আলাদা। আর সুরদাস যদি হন সাধক, সন্ন্যাসী, তাহলেও বলব, রবীন্দ্রনাথ সেই সন্ন্যাসকে কখনও বড়ো করে দেখেননি। সুরদাস কবিই, তাই প্রকৃতির প্রতি তার আকর্ষণ, রূপের প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু রূপ পরিবর্তিত হয়েছে তার জীবনে বাসনায়,

তাই রূপের জগৎ থেকে সে নিতে চায় স্বেচ্ছানির্বাসন। ওইদিপৌসের মতোই সে অন্ধ চোখে প্রায়শ্চিত্ত করবে, অন্ধ চোখে দেখবে "দেহহীন তব জ্যোতি"। রবীন্দ্রনাথের এই কবিকে বোঝার জন্য আমাদের আরও একটি চরিত্রকে বুঝতে হবে, কিন্তু সে চরিত্রের কথা আসবে পরে।

"সুরদাসের প্রার্থনা"য় দেখেছি ব্যক্তিজীবনের পাপবোধ, এমনকি কবির রূপ-বোধের সঙ্গে পাপবোধের মিশ্রণ। "ভাষা ও ছন্দে"র বাল্মীকির মধ্যে দেখেছি প্রতিভার দাহ, প্রতিভার অস্থিরতা। "সুরদাসের প্রার্থনা" ব্যক্তির যন্ত্রণা ও ব্যর্থতা; ইন্দ্রিয়জয়ের চেষ্টার মধ্যে আরো তীব্র হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ। "ভাষা ও ছন্দ" নৈর্ব্যক্তিক, কাব্যতত্ত্বের শিল্পিত রূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন উঠেছে একটি— সে প্রশ্ন কবিজীবন ও কাব্যের। কবির ব্যক্তিগত জীবন ও তার কবিতার সম্পর্ক কি? সুরদাসের ব্যক্তিজীবনের একটি পাপবোধ আর তার কাব্য এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক নেই? বাল্মীকির ব্যক্তিজীবনের কথা আমরা জানিনা বলে কি তাঁর কাব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিজীবনের খোঁজ পাবনা। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় তো ব্যক্তিজীবনের ঘটনা কীভাবে কাব্যে উৎসারিত হল, সেই ছবি আঁকতে দ্বিধা করেননি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলবেন কবির দুটো জীবন আছে, একটা জীবন বাইরের, যেখানে সে আর পাঁচজন মানুষেরই মতো সমাজসংসারের নিয়মের অধীন; আর একটা জীবন ভেতরের, যেখানে সে শুধু কবি। সেই ভেতরের জীবন খুঁজতে হবে শুধু তার কবিতায়। সুরদাসের অন্তর্দহন, তার পাপ, তার পাপবোধ সব ঐ বাইরের জীবন। বাল্মীকির অস্থিরতা, প্রতিভার অলৌকিক আনন্দ ও বেদনার ফলে মনের মধ্যে যে আততি তাও বাইরের জীবন। রামায়ণে আছে তাঁর অন্তর্জীবন। কালিদাসকে নিয়ে 'চৈতালি'র কয়েকটি কবিতায় এই প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ
কোথা তব রাজসভা কোথা তব গেহ
কোথা সেই উজ্জয়িনী— কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস, রাজ অধিরাজ।

তবু কি ছিল না তব সুখ দুঃখ যত
আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরই মতো
হে অমর কবি।...

জীবন মন্থন বিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে, কালিদাসের কাব্যে নেই তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে সেই মানুষের কথা যে মানুষ শুধু একটি কালের নয়, একটি বিশেষ সমাজের নয়, যে মানুষ চিরকালের। "নিদ্রাহীন রাতে / কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি"— এই প্রশ্ন করেছেন কালিদাসকে। অথচ সুরদাসের জীবন থেকে রবীন্দ্রনাথ এমন এক ঘটনা তুলে নিলেন যেখানে তার শেলবিদ্ধ বক্ষের যন্ত্রণা, নিদ্রাহীন রাত্রির আর্তনাদ। কালিদাসে তিনি দেখলেন "দুঃখ দৈন্য দুর্দিনের কোনো চিন্তা নাই।" সুরদাসের জীবনে তিনি দেখছেন "অতি অসহ বহ্নি দহন"। কবিতার আদর্শ সন্ধান করছেন রবীন্দ্রনাথ। সে আদর্শ পাচ্ছেনও কালিদাসে, কিন্তু কবির ব্যক্তি-জীবনকে তিনি তুচ্ছ করতে পারছেন কি? সুরদাসের পাপকাহিনী তার ব্যক্তিজীবনের কাহিনী, কিন্তু সেই ব্যক্তিজীবনকে অবহেলা করতে পারছেননা রবীন্দ্রনাথ।

"সুরদাসের প্রার্থনা"র কথা আপাতত থাক, আবার ফিরে যাই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কবিদের মধ্যে, আমি যাকে বলেছি, প্রথম ধারা, তার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের কল্পিত কবিদের মধ্যে প্রথম যাকে স্পষ্ট মূর্তিতে পাই সে হল "পুরস্কার" কবিতায় কবি। এই কবির জীবনের সমর্থন পাব ইতিহাসের কবি কালিদাসের মধ্যে। অন্যভাবে বললে, এই কবিতার ভেতরে মগ্ন হয়ে আছে কালিদাসের জীবন, বা বলা ভালো, কালিদাসের যে জীবনকে রবীন্দ্রনাথ 'চৈতালি' কাব্যে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। "পুরস্কার" কবিতার আরম্ভ হয়েছিল কৌতুকে, এক বর্ষামুখর দিনে, অনটনগ্রস্তা কবিগৃহিনীর সঙ্গে এক বৈষয়িক জীবনে উদাসীন কবির সঙ্গে কথোপ-কথনের মধ্যে সম্ভাবনা ছিল ব্যঙ্গ কিংবা কৌতুকের কাহিনী। রাজসভার বর্ণনার মধ্যেও সেই সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল। কিন্তু হঠাৎ "পুরস্কারে"র রাজা কাহিনীর সেই সম্ভবনাকে বদলে দিলেন, কবি শুধুই কাব্য পাঠ করে রাজাকে খুশি করলেন তাই নয়, রাজকণ্ঠের মালায় গৃহিনীকে ভুলিয়ে দিলেন সকালবেলার সব অভিযোগ। প্রাত্যহিকের যে গ্লানি কবিতাকে উত্তেজিত করেছিল, তা বিলীন হয়েছিল এবং রূপকথার কাহিনীর মতোই সমাপ্তি হল নিবিড় মিলনে, যেখানে সব প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু রূপকথার এই কবি যে কথা বলেন, সে কথাই-পরে রবীন্দ্রনাথ বলবেন

কালিদাসের উদ্দেশে

জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ
সকালে ফুটিছে সুখ দুখ লাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা
শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুলবৃহৎ গভীর মধুর
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর
মগন গগনতল
যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়াছে হৃদয়তরণী
জানেনা আপনা, জানেনা ধরণী
সংসার কোলাহল।

কবি শুনিয়েছেন রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী। কিন্তু কবির কথায় এমন কোনো কোনো লাইন আছে, এমন কোনো কোনো ছবি, যা কালিদাসকেও উদ্দেশ করে বলা যেত

এমনি বরষা আজিকার মতো
কতদিন কত হয়ে গেছে গত
নবমেঘভারে গগন আনত
ফেলেছে অশ্রুরাশি।

মাত্র কয়েক বছর আগেই অন্য ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছিলেন কালিদাসের প্রতি, 'মানসী'র এক কবিতায় :

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নববরষার
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের পরে করি বরিষণ
নববৃষ্টি বারিধারা।

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ খুঁজছেন তাঁর কবিতার লক্ষ্য, "পুরস্কার"-এর কবির কথা, তাঁর নিজের কথা।

ধরণীর তলে, গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব
সংসার মাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর
তারপর ছুটি নিব।

এই কবিতা লেখা হয়েছিল ১৮৯৩ সালে (শ্রাবণ ১৩০০), তার আট মাস আগে (কার্তিক ১২৯৯) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একটি গল্প— "জয়পরাজয়"। সেই গল্পের নায়ক এক কবি, আর নায়িকা এক রাজকুমারী। এই কবিকে একদিন বাধ্য হয়ে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত-কবির সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নামতে হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে তাঁর পরাজয় হয়েছিল। রাজা নিজ কণ্ঠের মালা পরিয়েছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের গলায়। পরাজিত কবি— যাঁর গানের বিষয় "সেই রাধা এবং কৃষ্ণ – সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ"— আজ তার সমস্ত রচনা অগ্নিকে সমর্পণ করলেন : "বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিলে, হে মোহিনী বহ্নিরূপিনী, যদি সোনা হইতাম তো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম— কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবী, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।" মৃত্যুর আগে জেনে গিয়েছিলেন তিনি পরাজিত হননি। রাজকুমারী অপরাজিতা স্বহস্তে রচিত পুষ্পমাল্য তাঁর কণ্ঠে পরিয়েছিলেন।

"পুরস্কার" কবিতায় "জয়পরাজয়"-এর রাজা পরিবর্তিত হয়েছেন, তিনি সমস্ত রাজভাণ্ডার দিতে চেয়েছেন কবিকে। কিন্তু কবি বলেছেন "কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে ওই ফুলমালাখানি"। অপরাজিতার স্থান নিয়েছে "পুরস্কারে"র শেষে কবির রমণী। পদ্য এবং গদ্যে দুই রূপকথারই কবি সেই পুরোনো 'কবিকাহিনী'তে যে ধারা শুরু হয়েছিল তারই সম্প্রসারণ। তাদের মধ্যে এসেছে পরিণতি এবং গভীরতা। আর এই পরিণতিতে দান আছে কবিজীবন ও কবিতার আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার। এই কবিরা গড়ে উঠছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে।

৬

কল্পিত কবি চরিত্র এবং ঐতিহাসিক কবি চরিত্র— এই দুই ধারার সঙ্গে আরেকটি ধারা এসে মিশেছে রবীন্দ্র-কাব্যে। একজন কবিকে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ সম্বোধন করেন, একজনের সঙ্গে কথা বলেন। সে কবি অবশ্যই তিনি স্বয়ং। নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন চলে, সেই কথোপকথন হয় তাঁর কবিতার বিষয়। এই কবিকে প্রথম পেয়েছি আমরা 'শৈশব সঙ্গীত'-এ। কল্পনা এই কবিকেই ডাক দিয়েছিল, "মোর সাথে এস কবি"। কল্পনাই ছিল এই কবির সারথি, কবির ভূমিকা ছিল স্রষ্টার।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যে আবার দেখা হয় সেই কবির। তার কণ্ঠে শুনি 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবির প্রতি তিরস্কার: "গান গাহি বলে কেন অহংকার করা।" যে কবি আত্মকেন্দ্রিক, ব্যক্তিগত দুঃখে বিহ্বল, যে কবি বিশ্ববিচ্ছিন্ন তার প্রতি ধিক্কার দেয় এই কবি

কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল
মোরে তোমাদের মাঝে করগো আহ্বান

এই কবির যে পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল যে সে পরাধীন দেশের মানুষ, দুঃখপীড়িত জন্মভূমির প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন মানুষ। সেই সঙ্গে এই পরিচয়ও পাই, সে আবেগবিহ্বল, ব্যক্তিগত আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত এক কবি। "নিন্দুকের প্রতি নিবেদন"-এ সে বলে

কত প্রাণপণ দগ্ধ হৃদয় বিনিদ্র বিভাবরী
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত কত ব্যথা ভেদ করি
রাঙা ফুল হয়ে উঠিছে ফুটিয়া হৃদয় শোনিত পাত
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মতো পোহাইয়ে দুখরাত

কবির এই যন্ত্রণার কথা আমরা পরে শুনব ইয়েটস্-এর কণ্ঠে "That young men tossing on their beds/Rhymed out in love's despair" কিংবা জীবনানন্দে "ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক/চেয়েছিলো— হাঙরের ঢেউ-এ খেয়েছিলো লুটোপুটি।" আবার "কবির প্রতি নিবেদন"-এ শুনি

হেথা কেন দাঁড়ায়েছ কবি
যেন কাষ্ঠপুত্তল ছবি?
চারিদিকে লোকজন চলিতেছে সারাক্ষণ
আকাশে উঠিছে খর রবি।

তখন বুঝি এই কবি 'কবিকাহিনী'র নায়কের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কবিকাহিনী'র সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে যে দ্বন্দ্ব চলছিল কবিকে নিয়ে তারও কিছু আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে। ১৮৭৮-এর জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ এক কবিতায় লিখেছিলেন

হে কবিতা— হে কল্পনা
জাগাও জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীনহীন…
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব যুঝিব দিনরাত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন যে এই কবিতা কোনো ইংরেজি কবিতার অনুবাদ। হতে পারে, কিন্তু এমন একটি কবিতা অনুবাদ করার কথা রবীন্দ্রনাথ যে ভেবেছিলেন, তাতেই তাঁর মনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কবির এই যে দ্বন্দ্ব, তারই স্পষ্ট রূপ আর কিছুদিন পরে ফুটে উঠল একটি বিখ্যাত কবিতায়: "এবার ফিরাও মোরে"। এখানে "ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো" কবির ছবির পাশেই কঠিন সংসারের ছবি— "স্ফীতকায় অপমান/অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান।" একদিকে কর্তব্যের ডাক "কবি উঠে এসো তবে", অন্যদিকে কল্পনার দুর্নিবার আকর্ষণ: "হে কল্পনে রঙ্গময়ী, দুলায়োনা সমীরে সমীরে/তরঙ্গে তরঙ্গে আর মোহিনী মায়ায়।" কবির পথ স্পষ্ট, তাঁর কর্তব্যও

ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবন কণ্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু আঁখি
প্রতি দিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্বজনে।

ফাল্গুন ১৩০০ সালে এই কথা লিখছেন রবীন্দ্রনাথ। এই বছর শ্রাবণে লিখেছেন "পুরস্কার"। আর এক বছর আগে লিখেছেন "জয়পরাজয়"। কালানুক্রমিকভাবে সাজালে দেখতে পাব প্রকৃতপক্ষে এদের নায়ক একজন, ধীরে

ধীরে তারই উত্তরণ হয়েছে এই প্রতীতিতে, এই বিশ্বাসে। "পুরস্কার"-এর কবিও বলেছিল একই কথা, অন্য ভাষায়

যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি— তবে ধন্য হবে মোর গান।

"জয়পরাজয়"— "পুরস্কার"— "এবার ফিরাও মোরে" এ তিনটি রচনার যে তিন কবি তারা অন্তরঙ্গে এক। যে দুই ধারার কবির কথা বলেছি, কল্পিত এবং ইতিহাসাশ্রিত, তাদের সঙ্গে কখনও অভেদ হয়ে উঠছে তৃতীয় ধারার কবি, যিনি প্রায়ই 'কবি' নামে সম্বোধিত হন বা যাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন চলে। এই তিন ধারার কবির মধ্য দিয়ে যা ফুটে উঠছে তাকে আমি বলতে চাই রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবন বা তাঁর কবিজীবনী।

৭

'ক্ষণিকা'র "কবি" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পাঠককে বলেছিলেন "কাব্য পড়ে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো।" এই কবিতা লিখেছিলেন ৫ আষাঢ় ১৩০৬। তার কয়েক বছরের মধ্যে লিখলেন "বাহির হইতে দেখোনা আমায় এমন করে" (উৎসর্গ ২১)। দুটি কবিতার সুর অবশ্যই পৃথক, বিপরীতমুখী; কিন্তু আমার কাছে দুটি কবিতার গুরুত্ব— রবীন্দ্র-জীবন বোঝার পক্ষে— সমান। পরিহাসের ছলে বলেছিলেন 'ক্ষণিকা'য় কবিতার মধ্যে কবির একটা ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে, কিন্তু সেটাই একমাত্র সত্য নয়। পরিহাস বাদ দিলেও, কথাটার গুরুত্ব কমেনা। কবিতার মধ্যে কি কবির জীবন পুরোটা ধরা পড়ে? যে জীবনটা কবিতায় ধরা পড়েনি সেটা কি মিথ্যা? তার বাস্তব ভিত্তিকে ভুলে গেলে, যে জীবনকে আমরা কবিতায় খুঁজব বা পাব, সে জীবন কি খণ্ডিত জীবন নয়? কেউ বলতে পারেন এরই উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'উৎসর্গে'র কবিতায়

মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের তরে

যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে
কবিরে পাবেনা তাহার জীবনচরিতে।

"জয়পরাজয়" গল্পেও রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবনে এরকম করিয়া কাটিয়া যায় — খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়। জীবনটা একটা পাঁচমিশালী রকমের জোড়াতাড়া—প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক। কেবল কবি যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ।" 'ক্ষণিকা'র "কবি" ও 'উৎসর্গে'র কবিতার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "কবিজীবনী" প্রবন্ধ (আষাঢ় ১৩০৮)। সেখানেও বলছেন, "কবির জীবন হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত কবির কাব্যের সহিত তাহার কোনো গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না।" রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে কবির জীবনী লেখা সম্ভব, সেখানে জীবন-বৃত্তান্তে বৃত্তান্ত অংশটি বাদ। নিজের সেই জীবনী লেখার চেষ্টাও করেন তিনি ১৩১১ সালে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কথাটা বলেননা, তা হল অন্তর্জীবনেরও তথ্য আছে। আর বহির্জীবনেরও নানা তথ্য আছে। তার সব তথ্যই সমান মূল্যবান্ নয়। কোনো তথ্যের সঙ্গেই কবির কাব্যের কোনো "গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না" যখন বলেন রবীন্দ্রনাথ, তখন কাব্যের ইতিহাসের বহু গভীর অভিজ্ঞতাকেই অস্বীকার করতে চান। ১২৯৯ সালে তিনি তাহলে কেন প্রশ্ন করেছিলেন বৈষ্ণব কবিকে

এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে!

বৈষ্ণব কবির জীবনের "বৃত্তান্ত" নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কেন? এই বৃত্তান্তের সঙ্গে কবিতার কোনো "গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ" নেই এমন কথা তো মনে হয়নি রবীন্দ্রনাথের। কাব্যের মধ্য থেকে কবির জীবনী রচনা করতে গেলেও পৌঁছতে হবে বৃত্তান্তে, বৃত্তান্ত থেকেও জীবনী রচনা করতে গেলে পৌঁছতে হবে কবিতায়। কবির জীবনী বৃত্তান্ত ও কবিতা দুয়েরই মিশ্রণ।

"কেবল কবি যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ"। কিন্তু এই সত্য এবং সম্পূর্ণতার যাচাই হবে কোন্ নিরিখে? এই গান সত্য কেননা এদের

পশ্চাদ্‌বর্তী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি কবির জীবনে সত্য। এরা সম্পূর্ণ কেননা কবির জীবনের অনুভূতিতেই এরা আকার পেয়েছে। সেইজন্য লঙ্গইন্যাস বলেছিলেন মহৎ কবিতার জন্ম হয় মহৎ জীবন থেকে। অসংখ্য কবি পৃথিবীতে অবশ্যই আছেন যাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের আচার আচরণের সঙ্গে তাঁদের সৃষ্টিকে আমরা প্রায়ই মেলাতে পারিনা, তখন রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা সান্ত্বনা পেতে পারি, কবিরে পাবেনা তাহার জীবনচরিতে। কিন্তু এমন কবিও আছেন যিনি এক মহৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষাওকরেছেন। "পুরস্কার"-এর কবি এবং "এবার ফিরাও মোরে"-র কবির প্রার্থনা এক মহৎ জীবনের।

১৯২২ সালে (১৩২৯ আষাঢ়) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন। এক কবিকে আশ্রয় করে ফিরে এসেছে এই মহৎ জীবনের, মহৎ কবিজীবনের ছবি। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রের গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা এর প্রতি ছত্রেই বিকীর্ণ, কিন্তু এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট মহৎ কবিজীবন, যে মহৎ কবিজীবনের কথা আমরা শুনেছি "পুরস্কার"-এর আর "এবার ফিরাও মোরে"র কবিকণ্ঠে। মিলিয়ে দেখা যাক

জানি তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।

ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর অর্থভরা।

অন্যায় অসত্য যত যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্র বেগে।

যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনই জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নির তেজে পূর্ণ করি।

শুধু জানি যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিন কবি— তাঁর কল্পনার কবি, ইতিহাসের কবি এবং যাকে তিনি কবি সম্বোধন করেন— কবিতার আদর্শের সঙ্গে খুঁজছে মহৎ জীবনকে, কখনও কাব্যে, কখনও জীবনে। বাল্মীকি খুঁজছেন মহাজীবনকে কাব্যের বিষয় করতে। সুরদাস খুঁজছেন জীবনের মধ্যে কলঙ্কহীন সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথের কল্পনার কবিও খুঁজছে মহৎ জীবন। আর রবীন্দ্রনাথ যাঁকে কবি সম্বোধন করেন, যাঁর সঙ্গে বলেন তাঁর আদর্শের কথা, তাঁকেও গড়ে তুলতে চাইছেন এক মহৎ জীবনের যোগ্য ক'রে।

৮

১৩২২ সালে (১৯১৫) 'ফাল্গুনী' নাটকে আবার দেখা গেল এক কবিকে। এই কবি বলে "আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি আঁকড়ে বসে থাকিসনে— বেরিয়ে পড়— প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।" আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়না এই কবিই লিখছেন এখন 'বলাকা'র কবিতা, আর এই কবিকেই আমরা চিনতে পারব 'পূরবী'র তপোভঙ্গ কবিতায়। তবে এই কবির মধ্যে নতুন একটি মাত্রাও যোগ হয়েছে—"আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য।" এই 'বৈরাগ্য'কে ব্যাখ্যাও করেছে কবি— "সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা,

তার সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সে-ই তো বৈরাগী, সে-ই তো পথিক, সে-ই তো কবি-বাউলের চেলা।"

এবার থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে কবিকে দেখব সে শুধু কবি নয়, কবি-বাউল, তার মধ্যে বৈরাগীর ধর্মকে দেখতে পাব, বৈরাগ্য বলতে রবীন্দ্রনাথ যে চলমানতার কথা বলেন সেই চলমানতাই তার ধর্ম। কবি এখন বদলাচ্ছে, তার সমস্ত আত্ম-কেন্দ্রিকতা কোথায় এখন অবলুপ্ত, সে এসে দাঁড়াচ্ছে সংসারের মাঝখানে। কবি এখন খুঁজে পাচ্ছে সংসারে তার যথার্থ কর্মক্ষেত্র।

এখন তোমার কাজটা কী বলো তো কবি।

মহারাজ, ওই যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেছে ওই কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে।

ওহে কবি, বল কী তুমি। এ সমস্ত কেজো লোকের কাজ, দুর্ভিক্ষের মধ্যে তোমরা কী করবে।

কেজো লোকেরা কাজ বেসুরো করে ফেলে, তাই সুর বাঁধবার জন্যে আমাদের ছুটে আসতে হয়।

ওহে কবি, আর একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।

মহারাজ, ওরা কর্তব্যকে ভালোবাসে বলে কাজ করে, আমরা প্রাণকে ভালোবাসি বলে কাজ করি।

এরপরে রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে কবি চরিত্রের আবির্ভাব হবে তাদের সঙ্গে 'ফাল্গুনী'র কবির সুর বাঁধা। 'ক্ষণিকা'র মধ্যে একটি কবিতা পাই "কবির বয়স"। এই কবিতার কবিকে সংসার ডাক দিয়ে জানিয়ে দেয় "কেশে তোমার ধরেছে যে পাক", প্রশ্ন করে "শুনতেছ কি পরকালের ডাক"। কবি ভবের কূলে বসে পরকালের ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবতে রাজি নয়, তার কাজ রয়েছে অনেক, তরুণ-তরুণীর মনের কথার প্রতিধ্বনি তুলবে কে বীণার তারে? গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর মনে কে জাগিয়ে তুলবে "ত্রিভুবনের গোপন কথা।" কে বলবে সংসারের হাসি কান্নার কথা? এই কবিতা লেখার আট বছর পরেই প্রকাশিত হয় 'শারদোৎসব' নাটক। এই নাটকে কোনো কবি চরিত্র নেই, কিন্তু একটি কবি চরিত্রের বীজ ছিল, কোথায় ছিল সেই বীজ সে কথা স্পষ্ট হবে আমাদের আলোচনার পরে। আপাতত যেটি স্মরণযোগ্য তা হল ১৯২১-এ রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব' ভেঙে তৈরি করলেন 'ঋণশোধ' আর সেই নাটকে দেখা দিলেন এক কবি। নাম তার শেখর। "জয়পরাজয়" গল্পের কবিরও

নাম ছিল তাই। 'ফাল্গুনী'র কবির মতো এই কবিও রাজার সঙ্গী। এই কবিরও মুখে এবং কাজে শুনি 'ক্ষণিকা'র "কবির বয়স"-এর কবির কথার প্রতিধ্বনি

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি একবয়সি জেনো।

এই কবি রাজাকে "নবীন" হবার মন্ত্র শেখায়, চিনিয়ে দিতে চায় মাটির মধ্যে রয়েছে যে "জীবন যৌবনের জাদুমন্ত্র"। এর পরে 'বসন্ত' নাটকেও দেখি এই কবিকেই। 'ফাল্গুনী'র বৈরাগী কবি, 'ঋণশোধ'-এর 'পরদেশী' আর 'বসন্ত'-এর 'চিরপলাতক'— একই কবির ভিন্ন ভিন্ন রূপ, একই চরিত্রের সম্প্রসারণ। ১৯২৩ সালের শেষ দিকে লেখা হল 'রথযাত্রা' নাটক, তার মধ্যে আবার পাওয়া গেল কবি. তবে এই কবি বলল এমন একটি কথা যা আমরা এত স্পষ্টভাবে আগে কোনো কবির মুখে শুনিনি।

সমাজ ভাগ হয়ে গেছে ব্রাহ্মণে-শূদ্রে, ভাগ হয়ে গেছে ধর্মাধর্মের অন্ধতায়। রথ যাদের টানে চলছিল তাদের টানে এখন আর চলে না। শূদ্রদলের টানে শেষ পর্যন্ত রথ যখন চলল পুরোহিতের অবিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, তখন নাটকে প্রবেশ করল এক কবি। সমাজ পরিবর্তনের, বিপ্লবের ঝড় যখন সব ওলটপালট করে দিতে চাইছে তখন আবির্ভাব হয় কবির। "মহাকাল বারেবারেই রথযাত্রায় কবিদের ডেকেছেন।"

সমাজবিপ্লবের কারণকে ব্যাখ্যা করে এই নতুন কবি। কিন্তু যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় কবির কি কাজ, কবি রথ চালাবে কিসের জোরে, তখন কবির যে উত্তর তার সঙ্গে 'ফাল্গুনী'র কবির উত্তরের পার্থক্য নেই কোনো। "সুর বাঁধবার জন্য আমাদের ছুটে আসতে হয়" বলেছিল 'ফাল্গুনী'র কবি। 'রথযাত্রা'র কবি বলে "আমরা মানি ছন্দ, আমরা জানি এক ঝোঁকা হলেই তাল কাটে।" 'ফাল্গুনী'র কবি বলেছিল, "ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্মা, আমরা ওদের গাল দিই, বলি নির্জীব"। 'রথযাত্রা'র কবি বলে, "তোমরা বিশ্বাস কর কঠোরকে— শাস্ত্রের কঠোর বা অস্ত্রের কঠোর সেটা হল ভীরুর বিশ্বাস, দুর্বলের বিশ্বাস, অসাড়ের বিশ্বাস।" 'ফাল্গুনী', 'ঋণশোধ' ও 'বসন্ত' এই তিন নাটকের কবির সঙ্গেই বিরোধ আছে সংসারীর, সেই বিরোধ 'রথযাত্রা'তেও, পুরোহিত সেখানে এই বিরোধী শক্তির প্রতীক। কিন্তু যে কথাটা রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে বলছেন এখন কবির ভূমিকা

সম্বন্ধে, তা হল তার আসল জোর, সুর ও ছন্দের। ইতিহাসের ছন্দে যখনই ধাক্কা লাগছে, তখনই রথ হচ্ছে অচল। কবি সমাজকে বলে চলেছেন সেই কথা যখন চারিদিকে আগুন লেগেছে, মনে যখন সংশয় জেগেছে। কবি কী করবে দুঃসময়ে। কবির উত্তর, "যারা রথ টানছে তারা চলবার তাল পাবে"। সমাজশক্তির অন্তঃস্থল স্পর্শ করবে কবি তার ছন্দে ও সুরে। এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ আগেও বলেছেন 'রক্তকরবী' নাটকে রঞ্জনের মধ্য দিয়ে। রঞ্জন কবি নয়, কিন্তু 'ফাল্গুনী', 'ঋণশোধ' ও 'বসন্তে'র কবিদের প্রধান ধর্মগুলি তার মধ্যে লুকিয়ে আছে, এমনকি 'রথযাত্রা'র কবির বীজ সেইখানে। "আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে", "রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম", "তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল, সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি", "ঐ দেখো, এসেছে আমার বীর মৃত্যুকে তুচ্ছ করে"। যে ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে বারবার নিয়ে যাচ্ছে কবি চরিত্রটির দিকে, সেই চলমানতা, যৌবনের জাদু, ছন্দ ও তাল সেই ভাবনা দিয়েই তৈরী রঞ্জন, তাই বলেছি রবীন্দ্রনাথের কবিদের সঙ্গে তার যোগ অন্তরের। রঞ্জন যক্ষপুরীতে এসেছিল হৃদয়হীন নিয়মতন্ত্র আর অমানবিকীকরণের জগতে ঝড় তুলতে, এই কথা জানিয়ে দিতে যে শক্তির সঙ্গে সুন্দরের সমন্বয় না হলে একদিন সব ভেঙে পড়ে। সেই কথাই বলছে 'রথযাত্রা'র কবি। "আমরা জানি সুন্দরকে কর্ণধার করলেই শক্তির তরী বশ মানে।"

৯

১৯২৮-এ (বৈশাখ ১৩৩৫) রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'শিবের ভিক্ষা', পরে যা রূপান্তরিত হল 'কবির দীক্ষা'য়। 'কালের যাত্রা'য় (১৯৩২/১৩৩৯) গ্রথিত হল সেই সংলাপ। এখানেও আছেন এক কবি। এই কবিকে বুঝতে হলে আমাদের যেতে হবে আরেক প্রসঙ্গে। শুধু এই কবি নয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই কবি চরিত্রকেই বুঝতে হলে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা অনিবার্য। রবীন্দ্র-কবিচরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর একটি চরিত্র, সে চরিত্র সন্ন্যাসীর।

সন্ন্যাসী চরিত্রও বয়ে চলেছে দুটি ধারায়। এক সন্ন্যাসীকে রবীন্দ্রনাথ গড়েছেন কল্পনার থেকে। আরেক সন্ন্যাসীকে তিনি পেয়েছেন আমাদের পুরাণ থেকে, কখনও আমাদের ইতিহাস থেকে। এই দুটি ধারাই যে শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে মিশেছে তাই নয়, তারা শেষ পর্যন্ত মিশে গেছে কবির চরিত্রে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে কবি ও সন্ন্যাসীর চরিত্রের টানাপোড়েন তাঁর অন্তর্জীবন। কবি চরিত্রের মতোই সন্ন্যাসীর

সূচনাও 'কবিকাহিনী'তে। কোন্ এক "উদাসী যোগী" 'কবিকাহিনী'র কবিকে বলেছিল "মানুষের মন চায় মানুষেরই মন"। এই উদাসী যোগীর কোনো পরিচয় নেই 'কবিকাহিনী'তে, কিন্তু যোগী যে কথা বলেছিল কবিকে তা আমাদের সন্ন্যাসী পরম্পরার সঙ্গে, অন্তত সন্ন্যাসের সংস্কারের সঙ্গে মেলেনা। কয়েক বছর পরে লেখা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৬) নাটকে দেখা গেল সেই সন্ন্যাসীকে, যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় 'রাক্ষসী প্রকৃতি' থেকে, যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় সংসার থেকে।

পথ দিয়ে চলিয়াছে, এরা সব কারা
এদের চিনিনে আমি, বুঝিতে পারিনে

সন্ন্যাসী, যোগী, "মুক্ত নির্বিকার / সংসারের গ্রন্থিহীন" এই তার গর্ব। কিন্তু 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ সন্ন্যাসী তার এই গর্ব হারায়, সে পৌঁছয় অভিজ্ঞতার নতুন ক্ষেত্রে, একদিন রূপান্তরিত সন্ন্যাসীর মনে হয় "এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে"। একদিন প্রবল আর্তনাদ করে উঠতে হয় তাকে

দূর করো, ভেঙে ফেলো, দণ্ড কমণ্ডলু
আজ হতে আমি আর নহিরে সন্ন্যাসী…
হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।

এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে পার্থক্য নেই 'কবিকাহিনী'র "উদাসী যোগী"র সঙ্গে; এই সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শুনি

আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে
নদী তরুলতা পাখি হাসিছে প্রভাতে

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পার্থক্য দেখিনা সেই কবির যিনি বলেন "ধরায় আছে যত মানুষ শত শত / আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি"। সন্ন্যাসী ও কবির অনুভূতি এখন একাকার।

কবি চরিত্রটির মতো সন্ন্যাসী চরিত্রটিও বারবার রবীন্দ্র-সাহিত্যে ফিরে ফিরে আসে এবং তাদের সমান্তরাল ধারাদুটি অনুসরণ করলে দেখি সন্ন্যাসী কখনও নেন কবির রূপ, কখনও কবি নিতে চায় সন্ন্যাসীর রূপ। তাদের সংঘাতও বাধে

মধ্যে মধ্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই রূপের সহাবস্থান খোঁজেন রবীন্দ্রনাথ। আগেই বলেছি রবীন্দ্র-সাহিত্যে সন্ন্যাসীর এক ধারা সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার সৃষ্টি, আরেক ধারা ইতিহাসের সন্ন্যাসী বা পুরাণের সন্ন্যাসীর ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। ইতিহাসের সন্ন্যাসী দেখা দিয়েছে কখনও বুদ্ধ, কখনও বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ, কখনও মধ্যযুগের সুরদাস কিংবা রামদাস কিংবা সনাতন চরিত্রে ; আর পুরাণের সন্ন্যাসী শিব। সন্ন্যাসের আদর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক বক্তব্য আছে যাতে মনে হতে পারে তিনি সন্ন্যাসী বিরোধী। যে সন্ন্যাস জীবনকে অস্বীকার করে, জগৎকে মিথ্যা বলে, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করে ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মকে ধ্যান করে, রবীন্দ্রনাথ সেই সন্ন্যাসের বিরোধী। আর সেই বিরোধিতার প্রধান নায়ক তাঁর কবি চরিত্র। কিন্তু আরেক সন্ন্যাসী আছেন তাঁর সাহিত্যে যিনি কবির সহচর, সেই সন্ন্যাসী রবীন্দ্র-কাব্যে বন্দিত হন নানা মূর্তিতে, তাঁকেই সম্বোধন করে তিনি বলেন

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর
ওগো শংকর, হে ভয়ঙ্কর

'ছবি ও গান'-এর "যোগী" কবিতায় দেখেছি এই সন্ন্যাসীকে

শিবের জটার পরে, যথা সুরধুনী ঝরে
তারাচূর্ণ রজতের স্রোতে
(তেমনি কিরণ লুটে সন্ন্যাসীর জটাজুটে
পুরব আকাশ সীমা হতে।

এই সন্ন্যাসীকে দেখি "নববর্ষ" (বৈশাখ ১৩০৯) প্রবন্ধে : "আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্র বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী—তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অভয় হোমাগ্নি এখনও জলিতেছে।" এরই প্রতিমান খোঁজেন রবীন্দ্রনাথ কখনও ধ্যানী শিবে, কখনও নৃত্যমত্ত নটরাজে। তাকে দেখি "পাগল" (শ্রাবণ ১৩১১) প্রবন্ধে : "সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্র প্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাঁহার দ্রিমি দ্রিমি ডমরু বাজিতেছে।...নৃত্য করো, হে উন্মাদ নৃত্য করো। সেই নৃত্যের চূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমান হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যেই তোমার জয় হউক।"

'নটরাজ'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

নটরাজ, আমি তব
কবি শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।

এই শিষ্যত্ব গ্রহণের সূচনা 'কবিকাহিনী'তেই। তার পরিণাম 'কবির দীক্ষা'য়।

১০

রবীন্দ্র-নাটকে প্রথম সন্ন্যাসী দেখা দিল 'শারদোৎসব' নাটকে। এই সন্ন্যাসী বিশেষভাবেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। আমাদের ইতিহাসে ও পুরাণে এই সন্ন্যাসীকে আমরা দেখিনি। তার আদর্শ জীবন-বৈরাগ্যে নয়। আবার ভোগে-লোভে-আসক্তিতে নয়। সে মুক্ত। পৃথিবীর সৌন্দর্য যেমন তাকে আনন্দ দেয়, তেমনই ব্যথা দেয় পৃথিবীর বেদনা। সে সকলের সঙ্গে যুক্ত, একদিকে শিশুর দল, অন্যদিকে রাজা, একদিকে ঠাকুরদাদা, অন্যদিকে কবি। 'শারদোৎসব'-এ কবি ছিলনা, কবি এল 'ঋণশোধ'-এ। কবি ও সন্ন্যাসীর মিলন ঘটল সেখানে।

'শারদোৎসব'-এর সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শুনি প্রকৃতির স্তুতি। তিনি যখন বলেন, "চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে, এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন" তখন ঐ সন্ন্যাসীর বুকের মধ্য থেকে জন্ম নেয় এক কবি, যে কবির গানে অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এসে মিলে যায়, মানবিক ও দৈবী একাকার হয়ে যায়। সেই কবিকে আমরা 'গীতাঞ্জলি'র কবি বলেই চিনতে পারি। 'ঋণশোধে'ও রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীকে মিলিয়ে দেন কবির সঙ্গে। ঠাকুরদাদা যখন কবি সম্বন্ধে সন্ন্যাসীকে বলেন, "এই যে মানুষটিকে দেখছ উনি বড়ো যে সে লোক নয়।" সন্ন্যাসী সায় দিয়ে বলে, পরদেশী, কবি "যেন একেবারে চিরদিনের চেনা", আবার "কিন্তু আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, যেন ওঁকে চেনবার জো নেই"। কখনই অভেদ নয় চরিত্রদুটি, কিন্তু প্রায়ই তারা একাত্ম। সন্ন্যাসী বলে, "আমি বেরিয়েছিলুম বিশ্বের ঋণ শোধ করতে", কবি গান গেয়ে উত্তর দেন :

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া
তোমায় আমায়
জনম জনম এই চলেছে
মরণ কভু তারে থামায় ?

'শারদোৎসব'-এ শেষ উক্তি ঠাকুরদাদার "হ্যাঁ, ভাই তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা"। এই কথাটিই 'ঋণশোধ'-এ কবির উক্তি। তারপরেই গান

শুরু হয় "আমার নয়ন ভুলানো এলে"। তাই বলতে চাই 'গীতাঞ্জলি'র কবির সঙ্গে যোগ দিয়েছে এক সন্ন্যাসী, যে সন্ন্যাসীকে আমরা এখন দেখেছি 'শারদোৎসব'-এ।

আরেক সন্ন্যাসীকে দেখি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে—ধনঞ্জয় বৈরাগী। এদের পার্থক্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু 'শারদোৎসবে'র সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিল আছে অন্তরঙ্গে। এদের দুজনের মিল এদের দুঃখের ধারণায়, যেখানে এদের মিল 'গীতাঞ্জলি'র কবির সঙ্গে। 'শারদোৎসবে'র সন্ন্যাসীর গান "তোমার বুকে শোভা পাবে আমার দুখের অলঙ্কার", আর ধনঞ্জয়ের উক্তি "যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আবার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ, সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না" একই মানুষের কথা। সেই মানুষেরই কথা

দুখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে
সুখে কখন্ বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি।

এরপর আবার সন্ন্যাসীকে দেখি 'ফাল্গুনী'তে, এবার তার রূপ অন্ধ বাউলের। এই অন্ধ বাউল প্রসঙ্গে একবার আমরা ফিরে যেতে পারি "সুরদাসের প্রার্থনা"য়। 'ফাল্গুনী'র বাউল বলছে "একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টি উদয় হল। সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারে আর ভয় নেই।" সুরদাসে যা ছিল সংশয় (থামো একটুকু, বুঝিতে পারিনে ভালো করে ভেবে দেখি / বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধার চিরকাল রবে সে কি?) 'ফাল্গুনী'তে তা এখন অভিজ্ঞতা, এখন তা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের পথ গেছে রুদ্ধ হয়ে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীটা পরিণত হয়নি মিথ্যায়।

ওই বাউলটা চুপ করে বসে থাকে, কথা কয় না, ভালো লাগছে না।
ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ।
যেন কালবৈশাখীর প্রথম মেঘ।

আবার,

মনে হচ্ছে ওর কপালে যেন কী সব খবর আসছে।
ওর সমস্ত গা যেন অনেক দূরের কাকে দেখতে পাচ্ছে।
ওর আঙুলের আগায় চোখ ছড়িয়ে আছে।
ওকে দেখলেই বুঝতে পারি কে আসছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে।...
আমার কী মনে হচ্ছে জান? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে

বিশ্বকবির গীতিকাব্য থেকে ভাব চুরি করে কবি যে নাটক লিখেছে তার প্রধান চরিত্রগুলির একটি এই অন্ধ বাউল, যে "চোখ দিয়ে দেখে না বলেই সে তার দেহমন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।" প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের একটা পর্ব থেকে কবি আর সন্ন্যাসীকে মেলাতে চাইছেন, সেইজন্য তাঁকে সৃষ্টি করতে হচ্ছিল এক বিশেষ সন্ন্যাসী। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে সন্ন্যাসীকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন জীবনবিচ্ছিন্নতা থেকে জীবনমুখিতায়, পরে সেই সন্ন্যাসীকে তিনি আনতে চাইছেন জীবনের কেন্দ্রে। আগেই বলেছি তাঁর কবিও সন্ধান করছে শুধু মহৎ কবিতা নয়, একটি মহৎ জীবন। এই মহৎ জীবনের প্রেরণা নানা মানুষের নানা কর্ম থেকে, কিন্তু বিশেষ করে মানুষের যে মহিমা রবীন্দ্রনাথ দেখেন নির্ভয়তার মধ্যে, অনাসক্তির মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে, সেই মহিমা তিনি প্রত্যক্ষ করেন বা আবিষ্কার করেন সন্ন্যাসীর মধ্যে। "রাত্রি" ('কল্পনা') কবিতায় দেখেছি এক সন্ন্যাসীর ছবি, যে সন্ন্যাসী বিশ্বের দুঃখপীড়িত :

পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর
চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ
তোমার নিখিল লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়াতে একাকী
দেখেছ বিশ্বের মুক্তিপথ

রুদ্ধ দেবালয়ের কোণে যে সন্ন্যাসী অন্ধকারে ভজন পূজন সাধন আরাধনায় ব্যস্ত, তার থেকে স্বতন্ত্র এক সন্ন্যাসী তাঁকে গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে কবির কোনো দ্বন্দ্ব হয়না কখনও। "তপোভঙ্গ" ('পূরবী') কবিতায় সেই দ্বন্দ্ব আবার দ্বন্দ্বের সমাধান দুইই পরিস্ফুট। "আমি কবি যুগে যুগে আসি তব তপোবনে" বলেই শুধু রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত নন, তিনি স্পষ্ট করে তোলেন কবি ও সন্ন্যাসীর দ্বন্দ্ব :

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য বিলাসী
দারিদ্র্যের উগ্রদর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ

এই দ্বন্দ্বের সমাধান রবীন্দ্রনাথ খোঁজেন তাঁর আদর্শ সন্ন্যাসীর কল্পনায়

হে শুভ্র বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণ বেশে।

কবি ও সন্ন্যাসীর এই দ্বন্দ্ব তা হলে রবীন্দ্রনাথের ধারণায় "ছদ্মরণ" মাত্র। সন্ন্যাসী

শেষ পর্যন্ত চাইছেন সুন্দরের হাতে পরাভব। তাই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সন্ন্যাসী শিব, যাঁর গৃহিণী অন্নপূর্ণা, যাঁর মধ্যে দারিদ্র্য ও সম্পদের, বৈরাগ্য ও প্রেমের বিরোধের সমাহার। তাই রবীন্দ্রনাথের আরেক সন্ন্যাসী— রামদাস— গান গায় :

অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার
সুখে আছে সর্বচরাচর
মোরে তুমি হে ভিখারি মার কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।

"তপোভঙ্গ" লেখার অনেক আগে একটি প্রবন্ধে ("আমেরিকার চিঠি", 'পথের সঞ্চয়', অগ্রহায়ণ ১৩১৯) রবীন্দ্রনাথ তুষারাচ্ছন্ন প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে লিখেছিলেন, "আমার মনে হইতেছে যেন তাপসিনী গৌরী তাঁহার বসন্তপুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া শুভ্রবেশে শিবের শুভ্রমূর্তি ধ্যান করিতেছেন। যে কামনা আগুন লাগায়, যে কামনা বিচ্ছেদ ঘটায় তাহাকে তিনি ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছেন।...এই তপস্যাকে বরণ করো, হে আমার চিত্ত, আপনাকে নত করিয়া নিস্তব্ধ করিয়া দাও...," রবীন্দ্রনাথ যে কবিকে সৃষ্টি করতে চান তাঁর জীবনে এ প্রার্থনা সেই কবির। সেই কবিই দীক্ষা নেয় শিবের কাছে।

১১

'রথযাত্রা'য় কোনো সন্ন্যাসী চরিত্র ছিলনা, 'রথের রশি'তে আবির্ভাব ঘটল সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসীর মুখেই শোনা যায় "সর্বনাশ এল", আর সেই সঙ্গে শোনা যায়, "ঐ তো রথের দড়ি, যত চলে না ততই জড়ায়। যখন চলে, দেয় মুক্তি।" সন্ন্যাসী বারবার আসে, আর ধুয়োর মতো শোনা যায় "সর্বনাশ এল।" সন্ন্যাসী ঘোষণা করে

কী হবে মন্তরে
কালের পথ হয়েছে দুর্গম
কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।

এ কথা কবির মুখেও শুনতে পেতে পারতাম, কারণ কবিও এই কথা বলছে অন্য ভাষায়। 'রথের রশি'তে লক্ষ করার বিষয় এই যে নাটকে যেখানে সন্ন্যাসী, সেখানে কবি নেই ; যেখানে কবি সেখানে সন্ন্যাসী। ভাষাতাত্ত্বিকের ভাষায় বলা চলে তারা যেন পরিপূরক অবস্থানে অবস্থিত। নাটকের শেষ মুহূর্তে কবি

যখন ঘোষণা করে

যারা যুগেযুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

তখন সন্ন্যাসী প্রবেশ করে ঘোষণা করে

জয় মহাকালনাথের জয়।

'কবির দীক্ষা'য় কবিকে বলা হয়েছে এক সন্ন্যাসীর কথা যিনি "শিবমন্ত্র দেন প্রলয় সাধনায়", কবিও বলছে "শিবমন্ত্র দিই আমিও"।

অবাক করলে,—
তুমি তো জানি কবি,
কবে হলে শৈব।

কালিদাস ছিলেন শৈব।
সেই পথের পথিক কবিরা।

আবার

শ্মশানে কেন দেখি তোমার ঐ দেবতাকে।
মৃত্যুতে তাঁর বিলাস বলে নয়, মৃত্যুকে জয় করবেন বলে।

একদিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর আদর্শ সন্ন্যাসী, "মহাকালনাথ"কে দেখতে চাইছেন তাঁর আদর্শের আলোকে, অন্যদিকে তাঁর কল্পিত সন্ন্যাসী ও ইতিহাসে-পাওয়া সন্ন্যাসীদের মধ্যে সৃষ্টি করছেন কঠিন দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বের থেকে জন্ম নিচ্ছে তাদের পরিশুদ্ধ মূর্তি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' তাই সন্ন্যাসীর জীবনের রূপান্তরকে দেখি, সংসার বিচ্ছিন্নতা থেকে সংসারের কেন্দ্রে তাকে যেতে হয়। "সুরদাসের প্রার্থনাতে"ও দেখি রূপের লালসা থেকে উত্তীর্ণ হবার কঠিন আত্মনিগ্রহ। প্রকৃতির "মোহিনীমায়া" দুভাবে "সন্ন্যাসীর ব্রতভঙ্গ" করছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'ও ব্রতভঙ্গের কাহিনী, জীবন অস্বীকারের ব্রত ভেঙে যায়, জীবন স্বীকারে। সুরদাসে প্রকৃতি পরীক্ষা করে সন্ন্যাসীকে, সেই পরীক্ষা কঠিন দুর্গম পথে চালিত করে কবি-সন্ন্যাসীকে। রবীন্দ্রনাথের কবি সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিচ্ছে এই জন্য যে সন্ন্যাসী তার সামনে উপস্থিত করেছে জীবনের এক বিশেষ আদর্শ। আর সেই আদর্শ গড়ে উঠছে সন্ন্যাসীর জীবনে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। 'শেষ সপ্তকে' কবি প্রার্থনা করছে সন্ন্যাসীর কাছে

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রুত হয়ে উঠছে সৃষ্টি।

আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গ তলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ
সন্ন্যাসের দীক্ষা।

এই সন্ন্যাসী মহাকাল, কিন্তু যে সন্ন্যাসী মানুষ তাকে সন্ন্যাসী হয়ে উঠতে হয় দুর্গম পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। সেইরকম এক সন্ন্যাসীকে আমরা দেখি 'চণ্ডালিকা' নাটকে (৯৩৪ভাদ্র ১৩৪০)। এই নাটকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিনা, তার কথা শুনি প্রকৃতির মুখে, কিংবা প্রকৃতির মা-র মুখে। এই নাটকে দুই শক্তির লড়াই, দুই মন্ত্রের লড়াই।

ওঁরা পুণ্যের জোরে টেনে আনেন মানুষকে। আমরা মন্তর পড়ে টানি,
পশুকে টানে যে ফাঁসে। আমরা মথন করে তুলি পাঁক।

আনন্দ জাগিয়ে তুলেছিল প্রকৃতির ভেতরকার মানুষকে, তার মনুষ্যত্বের মহিমাকে। সেই সঙ্গে প্রকৃতির মনের মধ্যে জেগে উঠেছে সন্ন্যাসীর প্রতি কামনা। "তাঁকে চাই মা। নিতান্তই চাই। তাঁর সামনে সাজিয়ে ধরতে চাই আমার এ জন্মের পূজার ডালি।" মা যখন ভয় পায় তার মন্ত্র পড়তে, যে মন্ত্র মথন করে তোলে পাঁক, প্রকৃতি বলে, "ভালোই সে ভালোই, নইলে পঙ্কোদ্ধার হয় না।" প্রকৃতি জানে, "মা, তোমার জীবসৃষ্টি আদিকালের। এদের মন্ত্র কাঁচা, এই সেদিনকার।...ওঁকে হারতেই হবে, হারতেই হবে।"

তারপর নাটক জুড়ে চলে সন্ন্যাসীর সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের কথা শুনি প্রকৃতির মুখে।

প্রথমে দেখেছি, আকাশজোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত দেবতার ফ্যাকাশে মুখের মতো। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে বেরোচ্ছে আগুন। তারপরে কুয়াশাটা স্তবকে স্তবকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল— ফুলে ওঠা ফেটে পড়া প্রকাণ্ড বিষফোঁড়ার মতো— লাল হয়ে উঠল রঙ। সেদিন গেল। পরের দিন দেখি। পিছনে ঘন কালো মেঘ, বিদ্যুৎ খেলছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, জ্বলছে আগুন সর্বাঙ্গ ঘিরে। আমার রক্ত এল হিম হয়ে।...যে পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে তোর অগ্নিনাগিনী ফোঁস ফোঁস করে তাকে ছোবল মারছে, চলছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখে প্রকৃতি বন্দনা করে সেই মহাকাল সন্ন্যাসী
হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ংকর
ওহে শংকর, হে প্রলয়ংকর

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, আত্মদহনের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সন্ন্যাসী পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, যে মন্ত্র জীবনের পাঁক মথন করে তোলে সেই মন্ত্রের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হয়। 'চণ্ডালিকা' নাটকে সেই পরিশুদ্ধ সন্ন্যাসী রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। 'চণ্ডালিকা' নাটকে সন্ন্যাসীর পরাজয়ের সেই করুণ নিষ্ঠুর মুহূর্তে আর্তনাদ করে ওঠে প্রকৃতি।

ওমা, রাখ্ রাখ্, রাখ্, ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র।...কী দেখলেম, ওগো কোথায় আমার সেই দীপ্ত উজ্জ্বল সেই শুভ্র নির্মল, সেই সুন্দর স্বর্গের আলো। কী ম্লান কী ক্লান্ত আত্মপরাজয়ের কী প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে। মাথা হেঁট করে এল।

রবীন্দ্রনাথের সন্ন্যাসী এইভাবে ক্লান্ত আত্মপরাজয়ের প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে হেঁটে চলে, শেষ পর্যন্ত ঐ আত্মপরাজয় থেকে সে উত্তীর্ণ হয় বিজয়ী বীরে। এই সন্ন্যাসী রবীন্দ্রনাথের কবির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অভিন্ন।

একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ গড়ছেন তাঁর সন্ন্যাসী, তেমনই অন্যদিকে গড়ে তুলছেন তাঁর কবি, বা বলা চলে, গড়ে তুলতে চাইছেন নিজেকে। তাই-আজ তাঁর এত কঠিন আত্মবিশ্লেষণ, নিজের সৃষ্টি নিয়ে এত সন্দেহ, সংকোচ। "এরা এত কোমল, এত স্পর্শকাতর"— বলতে পারেন নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে। আজ তিনি যেতে চান কঠিনের মধ্যে।

যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে
নিয়ে আসব কঠিন চিত্ত-উদাসীনের গান!

সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসীর প্রতিমা রবীন্দ্র-কাব্যে সারাজীবন ধরেই চলে আসছে, কিন্তু শেষ দশ বছরে তারা একটা বড়ো জায়গা করে নিয়েছে তাঁর কবিতায়। বিশেষ করে 'প্রান্তিকে' দেখি তাঁর সন্ন্যাসী আবির্ভূত হন প্রতিমার পর প্রতিমায়।

অনিঃশেষ যে-তপস্যা
প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত, সব দিতে, সব নিতে
যে বাড়ালো কমণ্ডলু
এ জনমে
শেষত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি।

জীবনের শেষ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ যেন এতদিনের যে আততি— কবি ও সন্ন্যাসীর— তার ইতি রচনা করে যান

বিস্মৃত স্বর্গের কোন্
উর্বশীর ছবি
বাঁধিতে চাহিয়াছিলে
কবি—
তোমারে বাহন রূপে
ডেকেছিল।
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি—
আদিম আত্মীয় তব ধূলি—
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্‌বিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ সন্ন্যাসী বলেছিল "এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে"; 'শেষ লেখা'র কবির আর সন্দেহ নেই— "জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।" সন্ন্যাসীও কবি দুই একই সঙ্গে বিবর্তিত হয়ে চলেছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে, শেষ পর্যন্ত তারা এক। 'বাঁশরী' নাটকের কথাগুলি স্মরণীয় বিশেষ করে :

বাঁশরি ॥ এতদিন আমার যত প্রণাম ছিল সব একত্র করে আজ এই দিলেম তোমার পায়ে।

পুরন্দর ॥ আর আমি দিয়ে গেলেম তোমাকে একটি গান তোমার কণ্ঠে সেটিকে গ্রহণ করো।

সন্ন্যাসীর পায়ে কবির প্রণাম, আর কবির কণ্ঠে সন্ন্যাসীর গান। একেই বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবন। আর রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন যখন দেখি, তাঁর জীবনের "বৃত্তান্ত"গুলি যখন পর্যালোচনা করি, তখন তাঁর অন্তর্জীবনের সঙ্গে তাঁর বহির্জীবনের কোনো বিরোধ আমি দেখিনা। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনের বৃত্তান্তের মধ্য দিয়েই দেখি, বা তাঁর জীবনের সঙ্গে বৃত্তান্তের সম্পর্ক সন্ধান করি, শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছই এই আজীবন মিলন-বিরোধের টানাপোড়েনে; তার কেন্দ্রীয় শক্তির নাম দিতে পারি কবি ও সন্ন্যাসী।

বিশেষ রচনা

ক্রান্তদর্শী : আমার সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

অন্নদাশঙ্কর রায়

'ক্রান্তদর্শী' শেষ হলো। এ বই কিন্তু আমার পরিকল্পিত 'রিনিউয়াল' বা পুনর্নবায়ন নয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী থীসিস্ লেখা যায়, কিন্তু উপন্যাস নয়। উপন্যাসে বহু চরিত্রের আসর, বিচিত্র চরিত্রের সমারোহ। তারা বলে, "আমরা কি তোমার হাতের পুতুল যে তোমার খুশিমতো নড়ব চড়ব নাচব। আমাদের খুশিমতো আমরা বাঁচব।" এমন অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। উপন্যাস একবার আরম্ভ করলে তার পরে সে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। চরিত্ররা মঞ্চে নেমে শেখানো কথা বলে না, এক বলতে গিয়ে আর বলে। এক করতে গিয়ে আর করে। আমার লেখনী কি আমার বাধ্য? সিম্বলটা যদিও আমার হাতে তবু বিন্দি কুকুর আমাকেই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেত, আমিই তার খেয়ালমতো চলতুম বা চালিত হতুম। এটাও সেইরকম একটা ব্যাপার। তার পর, অন্তরে একজন আছেন—রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বলতেন 'কৌতুকময়ী' আর গ্যেটে বলতেন 'ডাইমন' বা 'ডেমন'—তিনিও আমার কলম ধরে আমাকে লেখান। আগেও এ-রকম হয়েছে। উপন্যাস একজনের সৃষ্টি, একথা যেমন ঠিক তেমনি একথাও ঠিক যে উপন্যাস একজনের সৃষ্টি নয়। আর এইখানেই তার বিশেষত্ব। 'নতুন করে বাঁচা' নামে আমি প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে যে প্রবন্ধ লিখেছিলুম আমার পরিকল্পিত উপন্যাস সেই রচনারই রূপান্তর হতো। এটাই ছিল আমার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়। কিন্তু কার্যত তা হয়নি, কারণ উপন্যাসের বিষয়বস্তু একটি মানুষের ভাবনাচিন্তা নয়, অনেকগুলি মানুষের বহমান জীবনধারা। জীবন

বলতে অন্তর্জীবনও বোঝায়। আমার এ উপন্যাসে অন্তর্জীবনই প্রাধান্য পেয়েছে। একে নভেল অফ্ আইডিয়াজ বললে আমি আপত্তি করব না। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন ইনটেলেকচ্যুয়াল উপন্যাস! এতে তাঁর অনীহা ছিল, অথচ তাঁর 'গোরা' সেই বর্গেরই নয় কি?

এই উপন্যাস আমার অন্য একটি বাসনার পরিপূরণ। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও তার আনুসঙ্গিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিয়ে একটা এপিক উপন্যাস লেখা যায়। 'ঘরে বাইরে'তেও এর অবতারণা লক্ষণীয়। কিন্তু নতুন যুগের মহাভারত লেখা আমার সাধ্য নয় বলেই সেটি আমি অন্যান্যদের উপর ছেড়ে দিই। অথচ একজনকেও সে কাজে হাত দিতে দেখা যায় না। ব্রিটিশ শাসনকালে সেনসরের বা পুলিশের ভয়ে সে উপন্যাস লেখা যেত না। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও দেখা গেল যাঁরা লিখতে পারতেন তাঁদের আগ্রহ বা উদ্যম নেই। অবশেষে আমাকেই ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্ব তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অঙ্ক তথা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের শেষ পরিণাম নিয়ে এপিক না হোক বৃহৎ উপন্যাসে হাত দিতে হলো। এর একটি গোপন কারণ ছিল। 'সত্যাসত্য' ছয় খণ্ডে সমাপ্ত হলে কেউ কেউ আমাকে আরো একখণ্ড লিখতে অনুরোধ করেন। একজন বলেন বাদলকে বাঁচিয়ে দিতে। আরেকজন বলেন উজ্জয়িনীকে আমি অপাত্রে সম্প্রদান না করে যেন সুপাত্রে সম্প্রদান করি, দে সরকারের হাতে না দিয়ে সুধীরের হাতে দিই। কিন্তু বারো বছর ধরে ওই উপন্যাস লিখে আমি শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত। সপ্তম খণ্ড লিখতে সাধ বা সাধ্য কোনোটাই আমার ছিল না। তা ছাড়া বাদলের মৃত্যুতেই ও কাহিনীর যথার্থ সমাপ্তি। সেটা একটা প্রতীকী ঘটনা। ঝড়ঝাপটার যুগে বুদ্ধিজীবীর অপসরণ।

আমার উপন্যাসে পাত্রপাত্রী আমার কাছে জীবন্ত মানুষ। 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের সময় সুধী কি নিষ্ক্রিয় ছিল? না, সে বাদলের মতো বুদ্ধিজীবী নয়! তার পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তার কী ভূমিকা। আরো পরে গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের সময় তার কী অনুভূতি। সুধীরের ভূমিকাকে ঘিরেই নতুন উপন্যাস দানা বাঁধে। বাদলকে আমি সরিয়ে দিয়ে আর ফিরিয়ে আনতে পারিনে। কোনান ডয়েল যেমন শার্লক হোমসকে বাঁচিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সুধীরকে ফিরিয়ে আনা সম্ভবপরতার বাইরে নয়। কিন্তু 'সত্যাসত্যে'র সুধী যেমনটি "ক্রান্তদর্শীর" সুধী তেমনটি হতে পারে না। হলে পদে পদে জবাবদিহির দায় থাকে। না, সুধীকে আমি স্মরণ করলেও নিজের মতো

করে বাঁচবার ও বাড়বার স্বাধীনতা দিয়েছি। সেইজন্যে নাম পালটে দিয়ে 'সৌম্য' করেছি। সৌম্য সুধীই, তবু সুধী নয়। ঘটনার আবর্ত পড়ে সে তার স্থিতপ্রজ্ঞ স্বরূপ বজায় রাখতে পারেনি। সে বিনোবার মতো স্থিতপ্রজ্ঞ নয়। সৌম্য সৌম্যই। সে সুধী নয়।

সৌম্যকে ফিরিয়ে আনলে উজ্জয়িনীকেও ফিরিয়ে আনতে হয়। সে এসেছে অদৃশ্য এক টানে। তাকে আমি দে সরকারের হাতে ছেড়ে দিলেও তাদের বিয়ে দিইনি। সে বিধবা হয়েছে, এই পর্যন্ত নিশ্চিত। এর পরটা অনিশ্চিত। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে থাকতেও পারে, না করেও থাকতে পারে। ওকে নিয়ে আসি মঞ্জুলিকা নামে। ডাক নাম জুলি, সৌম্য যদি অবিবাহিত থাকে তবে ওকেও তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। তা বলে ওদের রাজনৈতিক মতবাদ একই রকমের হবে কেন? যার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেইটাই তো হবে। ত্রিশের দশকে সন্ত্রাসবাদের এক দুর্বার আকর্ষণ ছিল। জুলির পক্ষে সৌম্যর মতো একনিষ্ঠ গান্ধীপন্থী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। যতদিন না সে সৌম্যর পত্নী হয়।

উজ্জয়িনীকে নিয়ে এলে দে সরকারকেও নিয়ে আসতে হয়, সে আসে সুকুমার দত্ত-বিশ্বাস নামে। বার বার প্রত্যাখ্যাত হবার পর সে জুলির বান্ধবীকে বিয়ে করে ক্ষান্ত হয়। তবে সেইখানে তার ভূমিকা ফুরিয়ে যায় না। এই কাহিনীর শেষদিনটি পর্যন্ত সে আছে। আর আছে জুলির বান্ধবী মিলি, যার ভালো নাম মধুমালতী। তিনটি পুরনো চরিত্র ছাড়া আর সব চরিত্রই নতুন। মানস—বাদল নয়, যদিও সে সৌম্যর পুরনো বন্ধু। 'সত্যাসত্যে' তার উল্লেখ ছিল না। বর্তমান উপন্যাসে তারও একটি মুখ্য ভূমিকা। তারই মতো তার অপর বন্ধু স্বপনদারও। সৌম্য, মানস, স্বপন, কোন্ জন যে এই কাহিনীর নায়ক তা আমিও জানিনে। অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে স্বপনদাকে তথা মানসকে। একটা কথা বলে রাখি, মানসের সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকলেও আমি মানস নই বা মানস আমি নয়। তার স্ত্রী যূথিকাও আমার স্ত্রী লীলা নন।

অনেকগুলি চরিত্রই জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আস্ত ভাবে নয়। তারা যে যার নিজের মতো করে বেঁচেছে ও বেড়েছে। আমার শাসন মানেনি। নায়িকা যে কোন্ জন তাও আমি জানিনে। জুলি ও যূথিকার মতো দীপিকাদিও তিনজনের একজন। তিনটি পরিবারকেই এই উপন্যাসে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো একটিকে বিশেষ গুরুত্ব নয়। কাহিনীর প্রয়োজনে ঘটনাস্থল কখনো কলকাতা, কখনো পূর্ববঙ্গ, কখনো পশ্চিমবঙ্গ। শেষে দিল্লী।

স্থান কাল পাত্র। এই তিন নিয়েই উপন্যাস; পাত্রের কথা বলেছি, স্থানের কথাও বললুম। এবার কালের কথা। এই কাহিনীর কালসীমা ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি। হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণে যার শুরু, মহাত্মা গান্ধীর চিতারোহণে তার শেষ। 'সত্যাসত্যে'র কালসীমা ছিল মাত্র দুটি বছর, ১৯২৭ থেকে ১৯২৯। তার জন্যে লিখতে হলো ছয় খণ্ড। লাগল বারো বছর। সেই আন্দাজে এ গ্রন্থ লিখতে কত সময় লাগা সম্ভবপর, কয় খণ্ডে লেখা সমীচীন। নিশ্চয় অনেক বেশী। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার যৌবন বিগত হয়েছে, বার্ধক্য দিন দিন বেড়েছে। সময়মতো শেষ না করলে অসমাপ্ত গ্রন্থ পড়বেই বা কে? লিখব কি লিখব না করতে করতে পঁচাত্তর বছর বয়স পার হয়। আশির মধ্যে কি সব কথা বলে উঠতে পারব? আশি পর্যন্ত কি আমাকে বাঁচতে দেওয়া হবে? এক জ্যোতিষীর মতে চুয়াত্তর বছর বয়সেই আমার পরকাল।

কবিরাজ গোস্বামীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরম্ভ করে দিই। শুনেছি তিনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' শুরু করেন অতি বৃদ্ধ বয়সে। শেষ করতে নাকি সাত বছর লেগেছিল। মোটামুটি চার বছরের পাথেয় নিয়েই আমার যাত্রারম্ভ। লিখতে ও সংশোধন করতে লেগে গেল সাত বছর। সম্প্রতি বিরাশি পূর্ণ হয়েছে। অবাক হচ্ছি দেখে যে এখনো বেঁচে আছি। আমার মা বেঁচেছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর, আমার বাবা একষট্টি বছর। আমার ধারণা ছিল আমিও তাঁদের অনুবর্তন করব। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। যে কাজ আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারত না, সে কাজ আমাকে দিয়ে তিনি করাবেনই। অন্তরে আমি এই আশ্বাস পাই যে আমি যা জানি আর কেউ জানে না, সুতরাং আমাকেই জানিয়ে যেতে হবে ও তার জন্যে বাঁচতে হবে। বলা বাহুল্য, যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

তৃপ্ত হতুম যদি পাঁচ পর্বে লিখতে পারতুম। তেতাল্লিশের শেষ অংশ, চুয়াল্লিশের সবটা, পঁয়তাল্লিশের প্রথম অংশ ডিঙিয়ে যেতে হয়েছে। প্রায় দু'বছর ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম বেঁচে থাকতে, আরো বেশী ব্যাপার নিয়ে তৃতীয় পর্ব লিখতে। কে জানে কেমন থাকি বলা তো যায় না। তাই মাঝখানে একটা ফাঁক রয়ে গেল। যাক, আমি তো ইতিহাস লিখতে বসিনি। ইতিহাস যাঁরা লিখবেন তাঁরা সে ফাঁক পূরণ করবেন। আমার এটা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা উপাখ্যান। যেমন ডিকেন্সের 'আ টেল অভ্ টু সিটিজ্'। যার পটভূমিকাটা ফরাসী বিপ্লবের। কাহিনীটা কিন্তু দুই মহানগরীর ইতিহাসে

অখ্যাত কাল্পনিক নায়ক নায়িকার।

ডিকেন্স যখন স্থির করেন যে ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় একখানি উপন্যাস লিখবেন তখন তিনি সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কার্লাইলকে চিঠি লিখে পরামর্শ চান কোন্ কোন্ বই পড়বেন। কার্লাইল তার উত্তরে এক গাড়ী বই পাঠিয়ে দেন। ফরাসী বিপ্লবের ওপর লেখা বই ততদিনে একগাড়ী ওজনের হয়েছে। এতদিনে তিন গাড়ী কি চার গাড়ী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ, ব্রিটিশ অপসরণ তথা ভারতবর্ষের বিভাজন একত্র করলে এটিও কি একটি বিপ্লবাত্মক বিষয় নয়? বিশ্বের ইতিহাসের সেই আট নয় বছরের মধ্যে যা ঘটে গেল তা ফরাসী বিপ্লবের চেয়ে কি কম বিপ্লবাত্মক? এক গাড়ী না হোক, বেশ কিছু বই আমাকেও পড়তে হয়েছে। ডিকেন্স অবশ্য অত পড়েননি।

'ক্রান্তদর্শী' ইতিহাসভিত্তিক হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। রাজনীতিনির্ভর হলেও রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। বলতে পারা যায় বিশ্লেষণধর্মী মানবিক টেস্টামেণ্ট। বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিশ্বের ইতিহাসের, ভারতের ইতিহাসের, বাংলার ইতিহাসের একটা যুগসন্ধিকে। সে রকম যুগসন্ধি আগেও আসেনি, পরেও আসবে না। ওই একবারই এল আর গেল। দেশ দেশান্তরে কত পরিবর্তনই না ঘটে দেখা গেল! সমস্তটাকে একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা কি এক প্রকার রিনিউয়াল নয়? আমার পরিকল্পনামতো নয় যদিও; আমার মানসে ছিল টলস্টয়, থোরো, রাস্কিন, গান্ধী প্রভৃতির ধ্যানের জগৎ, ধ্যানের দেশ। এঁদের কেউ স্বদেশে সিদ্ধিলাভ করেননি, একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গান্ধী। সেই গান্ধীকেও ঘটনাচক্রে আপাত-ব্যর্থ হতে হলো। তাঁর দেশ গেল ভেঙে। শুধু এই দিক দিয়ে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও গান্ধীপন্থীদের পক্ষে এটা একটা সেট-ব্যাক। তা সত্ত্বেও আমরা লাভ করলুম রাজন্যদের সম্মতিসহ নতুন এক রাষ্ট্র, যার শাসনতন্ত্র সেকুলার। একজন নাগরিক যদি নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী হয় তবু সেও উচ্চপদারূঢ় হতে পারে। এই যে পরিবর্তন এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না, যদি মুসলিম লীগ অখণ্ড ভারতের কনস্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেম্বলিতে বসত। তার সঙ্গে মিটমাট করতে গিয়ে ধর্ম অনুসারে চাকরি, ধর্ম অনুসারে প্রমোশন, ধর্ম অনুসারে নির্বাচন ইত্যাদি মেনে নিতে হতো। নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদীদের হয়তো কোথাও স্থান হতো না। পার্লামেণ্টে, না গভর্নমেণ্টে। সেকুলারিজমের জন্যে দেশের লোক প্রস্তুত ছিল না। দাঙ্গাহাঙ্গামায় লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট না হলে, এক কোটি মানুষ ছিন্নমূল না হলে তার জন্যে মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হতো না; ইউরোপেও প্রস্তুত হয় বহু

শতাব্দীব্যাপী ধর্মঘটিত ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে।

একহিসাবে স্টে-ব্যাক, আরেক হিসাবে ফরওয়ার্ড স্টেপ। পদ্মা এক কূল ভাঙে, আরেক কূল গড়ে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে যাঁরা লিখবেন তাঁরা আমার চেয়ে ভাগ্যবান, তাঁরা এক গাড়ী বই পড়ে লিখবেন। তাঁদের লেখা হবে অবজেকটিভ। ব্যক্তি নিরপেক্ষ সত্য। নভেল লিখলে তার আদল হবে টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি'। কিন্তু তাঁরা আমার মতো প্রত্যক্ষদর্শী হবেন না। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি, আমি ভুগেছি, আমি শিখেছি, আমি যে আদৌ অংশ নিইনি তা নয়। এমন সুযোগ ও দুর্ভোগ আমার উত্তরসূরীদের হবে না। আমার মধ্যে প্যাশন প্রবল, আমার বিচার ডিস্‌প্যাশনেট নয়। আমি একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, সেই সঙ্গে গান্ধীভক্ত সেই সঙ্গে পশ্চিমের অনুরাগী, সেই সঙ্গে ইংরেজদের সহযোগী, সেই সঙ্গে মুসলমানদের বন্ধু, সেইসঙ্গে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনগণের সেবক। তাই আমার উপন্যাস সাবজেকটিভ। এর আড়ালে একটা দৃষ্টি আছে। ইংরেজীতে যাকে বলে Vision. তাই এর নাম 'ক্রান্তদর্শী'।

আরো অনেক কথা বলার ছিল, আরো অনেক চরিত্রকে আনার ছিল। কিন্তু সে প্রলোভন সংবরণ করতে হলো। বহুদর্শী হলেও আমি আর্টের সীমা মানি। এখন বিদায় নিতে হচ্ছে। সৌম্য, জুলি, মানস, যূথিকা, স্বপনদা, দীপিকাদি, সুকুমার, মধুমালতী, মীর সাহেব, বাবলী প্রভৃতিকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমার কাছে ওরা জীবন্ত মানুষ ও আপনজন। বিদায়ের দুঃখে আমি কাতর। সাত বছর ধরে আমি ওদের নিয়ে ছিলুম। এখন সব শূন্য মনে হচ্ছে।

গল্প

ক্ষিধেতেষ্টার যোগফল

শৈবাল মিত্র

আদিগঙ্গার ধারে দরমায় ঢাকা ছোট একটা চায়ের দোকানের অল্প দূরে দুহাতে পেট চেপে ধরে কমল দাঁড়িয়েছিল। দারুণ ক্ষিধেতে তার পেটের খাদ্যনালী বর্শায় বেঁধা আধমরা সাপের মতো মাঝে মাঝে মোচড় দিচ্ছে। প্রচণ্ড কষ্টে আবছা গলায় কমল কঁকিয়ে উঠল, মাগো…।

চায়ের দোকানের ভেতরে আলো জ্বলছে. কমল যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে আবছা অন্ধকার। একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলে দোকানে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে কমল আবার তাকাল। দেখল, মানুষগুলো খাচ্ছে।

কসকসে লাল আলুর দম বা ঘুগনিতে সেঁকা পাউরুটি ডুবিয়ে কেউ খাচ্ছে, কেউ খাচ্ছে শুকনো রুটি, বিস্কুট, চা। যারা খাচ্ছে, তাদের মুখে ছড়িয়ে পড়ছে খাওয়ার আনন্দ, অহমিকা, তৃপ্তি। লোলুপ চোখে কমল দোকানের দিকে তাকিয়ে থাকল। অন্ধকারে কমল দাঁড়িয়ে থাকায় দোকানের ভেতর থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে না। দেখা গেলেও সকলে গল্প, আড্ডা, খাওয়ায় এতো মশগুল যে বাইরে তাকাবার সময় নেই। কলকাতায় এখন টেস্ট ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। ফলে, শহরে এখন ক্রিকেট ছাড়া আলোচনা নেই। আকাশে, বাতাসে, ট্রামে, বাসে, দোকানে বাজারে শুধু ক্রিকেট, যেন ক্রিকেটই অন্ন, জীবন, অস্তিত্ব। আদিগঙ্গার ধারে হোগলায় ঢাকা, এই চায়ের দোকানেও ক্রিকেট নিয়ে তুমুল তর্ক চলেছে। তর্কের মধ্যে ক্রিকেটের ইতিহাস, ভূগোল, রাণ, রেকর্ড তুলোধোনা হয়ে যাচ্ছে। সকলেই ক্রিকেটবোদ্ধা বিশেষজ্ঞ, কেউ কারো চেয়ে কম নয়! অল্প দূরে, অন্ধকারে

পাড়ার একজন মানুষ যে দু'হাতে পেট চেপে ধরে ক্ষিধেতে বেঁকে যাচ্ছে, সে দিকে কারো তাকাবার সময় নেই। তাছাড়া কমল এমন কেউ নয় যে, তাকে তাকিয়ে দেখতে হবে। ময়লা চিটচিটে পুরোনো লুঙ্গি, ফুটোফাটা বুশশার্টের ওপর তুষের চাদর, মুখে বেশ কয়েকদিনের দাড়িগোঁফ, কমলকে দেখে ভিখিরী না মনে হলেও ভদ্রলোক ভাবা মুশকিল। কমলের বয়স বছর ত্রিশের মধ্যে হলেও এখনই সে কেমন বুড়োটে মেরে গেছে। মাথায়, মুখে পাকা চুল, দাড়ি বিজবিজ করছে। ক্ষুধার্ত কমলকে এই মুহূর্তে একজন লক্ষ্মীছাড়া, ভবঘুরে মানুষের মতো দেখাচ্ছে। অথচ কমল বেশ বিত্তবান, ভদ্রঘরের ছেলে, নিউ আলিপুরে একটা তিনতলা বড়ো বাড়ীর এক তৃতীয়াংশের সে মালিক। বাড়ীটার পেছনে খোলা বাগান, দোতলায় চক-মেলানো প্রশস্ত বারান্দা, একতলায় গ্যারাজ, গ্যারাজে গাড়ী না থাকলেও, সেটা ভাড়া দেওয়া হয়নি, তালাবন্ধ পড়ে আছে। কমলের দুই দাদা, বড়দা অমল ইঞ্জিনীয়ার, মেজদা বিমল পাগল, বিমলকে কিছুদিন আগে পাগলাগারদে পাঠানো হয়েছে। মেজদা বিমল আজন্ম পাগল হলেও কমল কিন্তু জন্ম থেকে ভবঘুরে ছিল না। স্কুলে যেত, লেখাপড়া করতো। কি করে যে সে এমন বাউণ্ডুলে, জীর্ণ হয়ে গেল, তার সঠিক খবর জানা যায় নি।

সম্ভবতঃ বাবা, মা মারা যাওয়ার পর দাদার সংসারের ফাইফরমাশ খেটে, রোজ দুধ, দোকান বাজার এনে, সারাটা দিন রাস্তায়, টিউবওয়েলের ধারে অন্য বাড়ীর ঝি চাকরদের সঙ্গে মিশে কমলের চেহারা আর চরিত্র বদলে গিয়েছিল। ধূসর হয়ে গিয়েছিল দেহ আর মনের মধ্যবিত্ত চূণকাম। কালো চুলদাড়ি অকালে পেকে গেছে।

কমলের বয়স যখন ন'বছর, তখন তার মা মারা গিয়েছিল, বাবাকে হারালো বারো বছর বয়সে। তখন বড়দা অমলের বয়স সাতাশ-আটাশ, বিয়ে হয়ে গেছে, বৌ আর দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে অমল রীতিমতো সংসারী। হাবাগোবা বিমলের তখন উনিশ বছর। পনেরো, ষোল, বছর বয়স পর্যন্ত বিমল শান্ত, চুপচাপ ছিল, তারপর হঠাৎ কেমন বদলে গিয়ে মারমুখী, ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠল। মায়ের মৃত্যু এবং বড়ভাই অমলের বিয়ের পর থেকেই বিমলের চরিত্রে এই বদলটা শুরু হয়েছিল। তখনও বাবা জীবিত। বিমলকে সারানোর অনেক চেষ্টা মা, বাবা দু'জনেই করেছে। কিন্তু নামী, দামী অনেক ডাক্তার দেখানোর পরেও বিমল সুস্থ হয়নি। ওষুধপথ্য খেয়ে কয়েকদিনের জন্যে সামান্য শান্ত, ধীর থেকেছে, তারপর যা ছিল তাই। বাবা মারা যাওয়ার পর অমল যখন সংসারের কর্তা হলো,

তখনও কিছুদিন বিমলের চিকিৎসা হয়েছে। ডাক্তার, ওষুধপত্র যেমন চলছিল, চলেছে। তারপর সবকিছু একদিন বন্ধ হয়ে গেল। বছর খানেক আগে গোবরার পাগলাগারদে বিমলকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাগলা গারদের নাম মানসিক হাসপাতাল হওয়ার পর থেকে সেখানেও জায়গা পাওয়া যায় না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে স্থানীয় এম. এল. এ, কে ধরে মেজভাইকে অমল সেখানে পাঠাতে পেরেছে।

বিমলকে গারদে পাঠাবার আগে দাদা আর বৌদির মধ্যে অনেক কথা, ঝগড়া, শলাপরামর্শ হয়েছে।

গভীর রাতে পৃথিবী যখন শব্দহীন, ঘুমিয়ে পড়েছে একতলায় নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে ঠিক ওপরের ঘরে দাদা বৌদির কিছু আলোচনা কমল মাঝে মাঝে শুনে ফেলেছে। বছরের পর বছর বাড়ীতে পাগল পুষে বৌদি যে জেরবার, সেটা তার কথা, আচরণে সবসময়ে বোঝা যেত। স্ত্রী মালতীর সঙ্গে কথায় যুক্তিতে অমল পেরে ওঠে না। ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল। মালতীর ভয় ছিল, তার ছেলেমেয়েরা বড়ো হচ্ছে, পাগলের সংসর্গে তারাও পাগল হয়ে যাবে। বিমলকে বাড়ী থেকে তাড়াবার জন্যে বছর দশেক ধরে মালতী খোঁচাচ্ছিল। অনেক চেষ্টার পর অমল যখন একটা আয়োজন করল, তখন দেখা গেল মালতী বেঁকে বসেছে, পাগল দেওরকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাতে তার সেরকম উৎসাহ নেই। তখনই একরাতে দাদা বৌদির কথা কমল শুনেছিল।

স্বামীকে মালতী বলেছিল, সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে এসে তোমার ভাই যদি সম্পত্তির ভাগ চায়, তখন কী হবে?

অমল বলেছিল, পাগলাগারদ থেকে কেউ সুস্থ হয়ে ফেরে না। বরং সেখানে গেলে তাদের পাগলামি বেড়ে যায়।

অমলের কথায় মালতী বিশ্বাস করেনি। দিন কয়েক পরে একজন নামী ডাক্তার যখন, বিমলকে দেখে আর তার ইতিহাস শুনে বলল যে, এ রুগী জীবনে সুস্থ হবে না, তখন অমল আর মালতী খুব নিশ্চিন্ত মনে পাগল মানুষটাকে পাগলাগারদে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল।

কমলের চোখের সামনে এসব ঘটেছে। কিন্তু কোনো কথা সে বলতে পারেনি। কথা বলার সাহস যেন তার মরে গেছে। তার মনের গভীরে কি এক ভয়, অসহায়তা সবসময়ে কাজ করে। কমলের মনে হল, সে এ সংসারের কেউ নয়, কাজের লোক, ঠিকে ঝি, চাকর বা রাঁধুনী, এ বাড়ীতে দুবেলা দুমুঠো ভাত আর রাতে ঘুমোবার সুযোগ পেয়ে বর্তে গেছে। প্রতিবেশী কোনো বাড়ীর

বন্ধুস্থানীয় চাকর, ঝি বা আদিগঙ্গার বস্তিবাসীদের কেউ কেউ যখন কমলকে তার অধিকারের কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কমল খুব উৎসাহ পায়, চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারপর গভীর রাতে বাড়ী ফেরার আগেই তার সব উৎসাহ, উদ্দীপনা নিভে যায়, সে ভারী বিপন্ন বোধ করে। অমলের মুখোমুখী হওয়ার আশঙ্কায় ভোরবেলায় বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসে।

মাঝে মাঝে মেজদা বিমলকে পাগলাগারদে কমল দেখতে যায়। বিমলের ওপর কোনো বাড়তি দরদ বা ভালোবাসার জন্যে কমল যে এটা করে, তা নয়। কিছুটা কৌতূহল, খানিকটা সময় কাটানো, আরো দু'একটা কারণ, যা কমল জানে না, তাকে গোবরায় টেনে আনে। পাগলাগারদে গিয়েও অনেকসময় মেজদার সঙ্গে কমলের দেখা হয় না। দেখা হলে ছোটভাইকে কোনো দিন বিমল চিনতে পারে, কোনোদিন পারে না। চিনলে জালের আড়াল থেকে বলে, আমায় একটা বিড়ি দে।

শেষে যেদিন কমল দেখতে গিয়েছিল, বিমল বলেছিল, আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবি?

দাদার প্রশ্নের কী জবাব দেবে কমল ভেবে পায় নি। চোরাচোখে চারপাশ দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বিমল বলেছিল, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল, এখানে থাকলে আমি মরে যাবো, আমাকে এরা মেরে···। কাছাকাছি পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠে বিমল চুপ করে গিয়েছিল।

খুব মন খারাপ করে সেদিন বাড়ী ফিরেছিল কমল।

দোকানের মধ্যে খাওয়ায় ব্যস্ত মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্ষিধেতে অবসন্ন কমল বিড় বিড় করল, মাগো, ভারী কষ্ট, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আদিগঙ্গার ধারে হোগলার ছাউনি আর ছিটে বেড়ার দেওয়ালে ঘেরা এই চায়ের দোকানটাকে বাইরে থেকে অকুলীন দেখালেও এ দোকানের চা আর খাবার দাবারের বেশ সুনাম আছে। বস্তির লোকজন, কুলি, মজুর ছাড়াও নিউ আলিপুর এবং আশপাশের কিছু ভদ্রলোকও এখানে আড্ডা জমায়। অল্পবয়সী ছেলেরাও অনেকে আসে। সব মিলে এই হতশ্রী পরিবেশে এটাই সবচেয়ে জমজমাট চায়ের দোকান। রুটি, আলুর দম, ঘুগনি খেতে খেতে যে চারপাঁচজন তরুণ এখন ক্রিকেট নিয়ে গুলতানি করছে, সকলেই কমলের চেনা, ওরা এখানকার নিয়মিত খদ্দের, রোজ সন্ধ্যেতে কিছু সময়ের জন্য আসে। ক্রিকেট নিয়ে আজ ওরা মত্ত, উত্তপ্ত। লুঙ্গির ওপর ময়লা চাদর জড়িয়ে দোকানের অল্প দূরে দাঁড়িয়েও ছেলেগুলোর

সব কথা কমল শুনতে পাচ্ছে না। কমল শুধু দেখছে, সাদা প্লেটে আলুর দমের সোনালী ঝোল, ধোঁয়া বেরোচ্ছে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে ঝালমশলার গন্ধ! বড়ো কষ্ট মা, পেটের ভেতর তীব্র ক্ষিধের হাঁচোর পাঁচোর। কমল ভাবছিল, সেও ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু জানে, দুচার কথা ক্রিকেট নিয়ে সে বলতে পারে। চায়ের দোকানে ঢুকে ক্রিকেটের আসরে সে যদি বসে যায়, দু'চার কথা বলে, কেউ আপত্তি করবে না। পকেটে পয়সা থাকলে কখনও ওখানে যায়, চা, ঘুগনি, আলুর দম পাউরুটি খায়। দোকানদার নিত্যগোপাল, তার মুটকি মেয়ে মালার সঙ্গে গল্পগুজব করে।

কমল দোকানে ঢুকতে কেউ তার দিকে তাকালো না, তাকাবার দরকার বোধ করল না। ছেলেগুলো কমলের চেনা, খাওয়া আর ক্রিকেটে তারা এখন মগ্ন। ভুঁইফোড়ের মতো পঁচিশবছর আগের একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নাম করে কমল বলল, সে ছিল সাংঘাতিক ব্যাটস্‌মান্।

কমলের মন্তব্য শুনে কারো কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না, কেউ আমল দিল না কমলকে। আরো দু'চার কথা বলে ছেলেদের আড্ডার মধ্যে সিঁদ কাটার চেষ্টা করতে করতে কমল ভাবছিল, এতোগুলো চেনা ছেলে, এদের কেউ কি একপ্লেট আলুর দম বা ঘুগনি, পাঁউরুটি আর চা খাওয়ার কথা তাকে বলবে না? নিশ্চয়ই বলবে। কথাটা মনে হতে আবেগে, উদ্দীপনায় কমলের গলার স্বর জীবন্ত, গম্ভীর হয়ে উঠল। পেটের মধ্যে আধমরা সাপটা দুমড়ে উঠছে, কমল তবু অটল, মুখে এতোটুকু কষ্ট, কাতরতা প্রকাশ করল না। কথা বলতে বলতে তার মুখের লালা শুকিয়ে জিভ চটচটে, ভন ভন করছে মাথা; চোখের সামনে পলকের জন্যে অন্ধকার, কমল ভাবছে এখনই বলবে, কেউ একজন প্রশ্ন করবে, কী খাবেন? পাঁউরুটির সঙ্গে আলুর দম, না ঘুগনি?

কিন্তু নাহ্। সেরকম প্রশ্ন কেউ করল না। বরং কমলের ময়লা, চিটচিটে, দুর্গন্ধমাখা পোশাক দেখে, অথবা তার বকবকানিতে বিরক্ত হয়ে ছেলেরা দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ক্ষোভে রাগে, জলন্ত চোখে নিত্যগোপাল তাকাল কমলের দিকে। মুখ ঝামটা দিয়ে মালা বলল, তুমি কেমন লোক গো? এক সন্ধ্যেতেই পরপর দু'বার আমাদের খদ্দের ভাগিয়ে দিলে?

মুখরা, স্বাস্থ্যবতী মালার ঝেঁঝে ওঠা দেখে ভয়ে, লজ্জায় কমল গুটিয়ে গেল।

মালার অভিযোগ মিথ্যে নয়। পাঁচটা নাগাদ পাড়ার একদল বয়স্ক ভদ্রলোক

চা, বিস্কুট, টোস্ট নিয়ে রাজনীতির আলোচনায় যখন মশগুল, তখন হঠাৎ কোথা থেকে কমল এসে সেই আলোচনায় নাক গলাতে চেষ্টা করেছিল। প্রবীণ ভদ্রলোকরাও প্রথমে পাত্তা দেয়নি কমলকে। কিন্তু একটুপরেই মণ্ডল, টেম্পল স্ট্রীটের কুঞ্জবাবু ধমকে উঠে কমলকে বলেছিল, তুমি থামোতো বাপু! আমরা নিজেদের মধ্যে গলা করছি; তার মধ্যে তুমি আসো কোথা থেকে?

তখনও ধমক খেয়ে অপমানিত কমল ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। সে বলতে চাইছিল, আলোচনার, কথাবলার এক ফোঁটা ইচ্ছে বা শক্তি আমার নেই, নিছক ক্ষিধে, ভীষণ ক্ষিধে, দুটো পাঁউরুটি আর এক কাপ চা পেলে আমি এখনই বোবা হয়ে যাবো। ছেলে মেয়েদের নিয়ে দাদা বৌদি পুরীতে বেড়াতে গেছে, তিনদিনের জায়গায় পাঁচ দিন হয়ে গেল, তারা এখনও বাড়ী ফেরেনি। ভাঁড়ারে, হেঁসেলে দু'দিনের মতো চাল, আলু, ডাল, এবং আরো যা ছিল, সব শেষ। গত দু'দিন যে কীভাবে আছি…।

কথাগুলো মুখে বলতে পারেনি কমল। মাথা হেঁট করে বেঞ্চের এককোনে বসেছিল। প্রবীন ভদ্রলোকেরা তাড়াতাড়ি চা, বিস্কুট খেয়ে উঠে যাওয়ার পর নিত্যগোপাল খেঁকিয়ে উঠেছিল কমলকে। বলেছিল, পাকা বাড়ীতে থাকলেই ভদ্রলোক হয় না। নিজের ওজন বুঝে চলতে শেখো…।

পেটে ক্ষিধের নিষ্ঠুর দাপাদাপি, নিত্যগোপালের সব কথা কমলের কানে ঢোকে নি। সে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে আদি গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেছিল। ময়লায় থকথকে কালো, নিশ্চল জল, সে দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেছিল, মাগো, বড়ো ক্ষিধে!

তারপর দিন শেষ হলো, ছায়া নামলো, অন্ধকারে ঢেকে গেল চারপাশ। ক্ষিধেয় ছটফট করছে পাকস্থলী, আদিগঙ্গার ধার থেকে উঠে বাড়ীতে আসার পথে দূর থেকে দোকানের ভেতরটা আবার কমলের নজরে পড়েছিল। অনেকগুলো চেনামুখ গল্প করছে, খাচ্ছে আলুরদম, ঘুগনি-পাঁউরুটি, চা। কমল আর নড়তে পারেনি। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে দোকানের ওপর লোলুপ নজর রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

দোকান থেকে দ্বিতীয়বার অপমানিত হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কমলের মনে হলো, পৃথিবী টলমল করছে, এখনি সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। সেই অন্ধকার

জায়গাটায় কমল আবার গা ঢাকা দিয়ে বসল, তার দুচোখের দৃষ্টি ঝাপসা। এখন কেউ চেনা লোক এখানে নেই, যার বাড়ীতে গিয়ে সে কিছু খেতে পারে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দাদা, বৌদি হয়তো কোনো সম্পর্ক রাখে না বলেই কমলের সঙ্গেও তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। আত্মীয়দের কারো সঙ্গে রাস্তায়, বাজারে দেখা হলে, তারাও কমলকে না দেখার ভান করে। তাদের চোখেও কমল চাকর-বাকরের বেশী নয়। চাকর, ঝি আর বস্তির যে সব মানুষের সঙ্গে কমলের চেনা, মেলামেশা, তাস খেলা, তারা কমলকে ঠিক বিশ্বাস করে না, তাকে নিয়ে রগড়, তামাশা করে। তাদের কারো কাছে খেতে পাওয়ার কোনো আশা নেই। ক্ষিদে, ক্লান্তিতে বিকল, অসাড় শরীর, পাকস্থলীর ভেতরে কামড়টাও যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। কমলের দু'চোখ বুজে আসে। আবছা তন্দ্রার মধ্যে ভেসে ওঠে মায়ের মুখ। মৃত মাকে এখনও স্পষ্ট মনে আছে কমলের। গাঢ় সুখ আর স্বপ্নের মতো ছিল সে দিনগুলো। বাবা যতোদিন বেঁচে ছিল, ততোদিন কমলের গায়ে কোনো আঁচ লাগেনি। বাবার মৃত্যুর পর কবে যে তার ঘাড়ে দুধ আনা, বাজার করা, রেশন তোলার দায়িত্ব চাপলো, কেরোসিনের লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে স্কুলে যাওয়া লাটে উঠলো, যে সব কথা কমলের আজ মনে পড়ে না। কিন্তু সে যে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশতে, কথা বলতে, স্কুল যেতে ভয় পাচ্ছে, তার বুদ্ধি যে আর বাড়ছে না, বাড়বে না, থমকে, চিরতরে থেমে গেছে, এটা সে টের পেয়েছিল। মাঝে মাঝে দোকান, বাজার থেকে বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করতো না। চেনা কোনো ড্রাইভার বা কাজের লোকের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা কোনো বাড়ীর রকে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিত। বিড়ি খাওয়া শিখল। বাজারের পয়সা মারতে শুরু করল। দাদা আর বৌদি সম্পর্কে ভয় আর আতঙ্ক ক্রমশ বাড়তে থাকল। দাদা, বৌদি তখন কম অত্যাচার করেনি কমলের ওপর। অনেকদিন খেতে দেয় নি কমলকে, বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে। তারপর একদিন বাজার করার কাজ থেকে কমল রেহাই পেয়েছিল। দাদার সংসার থেকে এখন সে দুবেলা দুমুঠো ভাত পায়, তার জন্যে কমলকে দাম দিতে হয়। নগদ টাকায় কমল দাম দেয় না, মাসিক আড়াইশো টাকা হিসেবে খরচ ধরে একটা মোটা খাতায় সে দশবছর ধরে সই করে যাচ্ছে। সে খাতায় কি লেখা আছে, কমল জানে না, জানার ইচ্ছে আগ্রহ, কিছুই তার নেই। যে কোনো খাতায়, কাগজে কমল সই করতে রাজী। তার ধারণা, হারাবার মতো তার কিছুই নেই। শরত শেষ, হেমন্ত

শুরু হয়েছে, বাতাসে সিরসির ভাব সন্ধ্যের পর হিমে ভিজে উঠছে মাটি। শরীরে চাদর থাকলেও শীতশীত করছিল কমলের। একটু বোধহয় ঘুমিয়েও পড়েছিল। হল্লা শুনে দোকানে নজর পড়তে নতুন একদল ক্রেতাকে কমল দেখতে পেল। এরা আশপাশের বস্তির মানুষ। সকলেই কমলের চেনা, দু' একজন কমলের সমবয়সী। নানা ধান্দায় এদের সারাদিন কেটে যায়। সন্ধ্যের পর এই দোকানে অল্প সময় আড্ডা মারে, কোনোদিন আলুর দম, ঘুগনি, রুটি খায়, কোনোদিন শুধু চা। কিছু না খেয়ে মাঝে মাঝে শুকনো মুখে চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু প্রায় রোজ টালিগঞ্জের ভাঁটিখানার পাশে বাংলামদের দোকানে হাজিরা দেয়। আকণ্ঠ দিশি মদ খেয়ে মাঝরাতে টলমল পায়ে বাড়ী ফিরে বৌ আর ছেলেমেয়েদের ঠেঙায়। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

কমল শুনতে পেল, সিনেমা নিয়ে তুমুল আলোচনায় দোকান গরম হয়ে উঠেছে। নায়ক নায়িকার গোপন জীবন নিয়ে চড়া বিতর্ক, হাত-পা নাড়া, দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুনি একটা খুন হয়ে যাবে। দু'জন চা নিয়ে বসেছে, বাকিদের সামনে কিছু নেই। চেনা মানুষগুলোকে দেখে কি এক আশায় কমল পেটের মধ্যে ক্ষিধের তীব্র কামড়, অসহ্য যন্ত্রণা আবার অনুভব করল। ডুকরে উঠলো, মাগো, বেজায় ক্ষিধে···।

দোকানের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে কমলের মনে হলো, ফের একটা সুযোগ এসেছে, আর একবার সে চেষ্টা চালাতে পারে। রাজনীতি আর খেলার আলোচনায় ঢুকতে গিয়ে যে অপমান তার হয়েছে, এখানে তা হবে না। তাকে এ মানুষগুলো নিশ্চয় অপমান করে তাড়িয়ে দেবে না। তাছাড়া রাজনীতি আর ক্রিকেটের চেয়ে সিনেমার সম্বন্ধে কমল অনেক বেশি জানে। পকেটে পয়সা থাকলে এখনও সে সিনেমা হলে লাইন লাগায়। সিনেমা নিয়ে তাই তার বলার যোগ্যতা এবং অধিকার আছে। কিন্তু কথা বলা বা আলোচনা নয়, একটা ছুতো করে দোকানে ঢুকে সে কিছু খেতে চায়। এক প্লেট আলুর দম বা ঘুগনি আর দু' টুকরো রুটি পেলেই সে বেঁচে যাবে। এটুকুই অনেক, অমূল্য। সিনেমার আলোচনার মধ্যে কেউ হয়তো এক প্লেট আলুর দম আর রুটি কমলের দিকে এগিয়ে দেবে। কথাটা ভেবে কমলের দু চোখ আবেশে প্রায় বুজে এলো। অন্ধকার ছেড়ে আলোকিত দোকানের দিকে কমল গুটি গুটি এগিয়ে গেল। কমল দোকানের কাছাকাছি যেতেই যারা দোকানের মধ্যে ছিল, মোট চারজন, পঞ্চা, কালু, নাড়ু, ঘোঁতন দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। চারজনই কমলের চেনা। পঞ্চা আর

ঘোঁতনের সঙ্গে কমল প্রায়ই আদিগঙ্গার ধারে বসে টুয়েন্টি নাইন খেলে। ওখান থেকেই আরো একজন পার্টনার জুটিয়ে নেয়। কমলকে দেখে ঘোঁতন প্রশ্ন করল, কি গুরু, আলুর দম খাচ্ছো? সাঁটাতে যাচ্ছ?

ঘোঁতনের প্রশ্নের কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে কমল ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকল।

দেখছিস কি, চল আমাদের সঙ্গে।

কমলের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে নাড়ু বলল।

কোথায়, কমল জানতে চাইল।

রতনের ঠেকে—কালু বলল।

আমি ওসব খাই না, কমল বলল।

কথাটা শেষ করেই কমল বুঝল যে সে বেফাঁস কিছু বলেছে। তাই সত্যি কথাটা সে বলে দিল, সারাদিন কিছু খাইনি, ক্ষিধেতে মরে যাচ্ছি, পকেটে একটা পয়সা নেই···।

কমল কথা শেষ করার আগেই পঞ্চা বলল, আমরা কি পেট বোঝাই করে খেয়ে মাল টানতে যাচ্ছি? অসহায়, কাতর চোখে কমল তাকিয়েছিল পঞ্চার দিকে। চারজনের মধ্যে পঞ্চাই একটু বয়স্ক, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স, গুরুগম্ভীর মানুষ। খিস্তি, দাঙ্গা, পঞ্চা বিশেষ করে না। কমলের কাঁধে হাত রেখে পঞ্চা বলল, আয়, আমরা যা খাবো, তুইও খাবি, ক্ষিধেটাও একটা নেশা, বড়লোকী নেশা, সে নেশা করার সামর্থ আমাদের নেই, তাই আর একটা নেশা দিয়ে ক্ষিধের নেশাকে আমাদের তাড়াতে হয়।

রাস্তায় বলা পঞ্চার কথাগুলো তখন বুঝতে না পারলেও রতন সাহার বাংলা মদের দোকানে বসে দু'তিন গ্লাস খাওয়ার পরেই সে কথাগুলো কমল ষোল আনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল। প্রথম তিন চার চুমুক খাওয়ার পরে কমলের গলা, বুক, পেট যেন পুড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, পাকস্থলীটা যেন পেটের বাইরে ছিটকে পড়বে। ধীরে ধীরে কষ্ট যন্ত্রণা কমে গেল। দিশি মদের নেশায় ভরে গেল তার পেট, বুক, মাথা, গোটা শরীর, মনে হলো এমন ভরপেট ভুরিভোজ হয়েছে যে আর কোনোদিন ক্ষিধে পাবে না।

শালপাতায় করে ভিজে ছোলা আর কুঁচো পেঁয়াজ এনে ঘোঁতন সামনে রাখল। সকলেই টুকটাক ছোলা পেঁয়াজ খাচ্ছে। কমলও খেল। কিন্তু খাওয়ার সেই তীব্র ইচ্ছে তার কেটে গেছে।

কিছুদিন আগে মদের দাম বেড়েছে। এই দাম বাড়ার খবর যারা জানে না, আর জেনেও যারা মেনে নিতে পারছে না, কাউন্টারে দাম দেওয়ার সময় তারা ঝগড়া করছে। মুশকো কালো, দৈত্যের মতো চেহারা বদমেজাজী দোকানদার মাঝে মাঝে এমন হুঙ্কার ছাড়ছে যে, ঝগড়া বেশিদূর গড়াচ্ছে না। দোকানদারকে দেখিয়ে কালু বলল, এ হলো রতনের ভাই যতন, পুরোণো মাস্তান, একবার রেগে গিয়ে পাশাপাশি বসা দুই খদ্দেরের মাথা যতন দুহাতে ঠুকে দিয়েছিল। ঝুনো নারকোলের মতো দুজনের মাথা ফটাস করে ফেটে গিয়েছিল। তারপর হৈচৈ মারামারি…। যতনের জন্যে খদ্দেরদের মেজাজ খুব বেশী না চড়লেও গুজ-গুজ আলোচনা থামল না। দিশি মদের দাম বাড়িয়ে গভর্ণমেণ্ট যে অন্যায় করেছে, এটা যে গরীবদের পেটে লাথি মারার সামিল, একথা অনেকেই বলতে লাগল।

নাড়ু বলল, চাল ডালের দাম বেড়েছে বলে পার্টিগুলো রোজ মিটিং মিছিল করছে, অথচ মদের দাম বাড়ল, সে নিয়ে কেউ মুখ খুলছে না। আমাদের কথা কেউ ভাবে না।

ঘোঁতন বলল, বাড়াতে হলে বিলাইতির দাম বাড়াও, বড়োলোকেরা খায়, দাম বাড়লে তাদের গায়ে লাগে না।

গম্ভীর মুখে কালু বলল, এই জন্যে আমি চুল্লু খাই। বাংলু আর চুল্লু, মাল একই। বাংলু থাকে বোতলে, চুল্লু ব্লাডারে। চুল্লুর দাম বাংলুর অর্ধেক।

সঙ্গীদের সব কথা কমলের কানে ঢুকছে না। ঢুকলেও পুরোটা সে বুঝছে না। মদের লাইনে সে খুব পাকা নয়, চুল্লু, বাংলুর নাম শুনেছে, দু একবার চেখেছে, তফাৎ বোঝে না। পাশে বসা গম্ভীর পঞ্চার দার্শনিক কথাগুলো বরং শুনতে ভালো লাগছে কমলের। পঞ্চা বলছে, ভাত খাওয়ার অনেক ঝামেলা, ডাল চাই, তরকারি চাই, আরো নানা জিনিস চাই, দুবেলা ভাত খাওয়ার খরচ মাথাপিছু যা দাঁড়ায়, হিসেব করলে মাথা ঘুরে যাবে। মাল খাওয়ার কোনো ঝামেলা নেই। একটু ছোলা পেঁয়াজ জুটলে ভালো, না জুটলে জিভে কাঁচা নুন ঠেকিয়ে গিলে যাও। সন্ধ্যেবেলায় একপেট বাংলা বা চোলাই খেলে পরের দিন বিকেল পর্যন্ত জিভ, মুখ, পেট অসাড় হয়ে থাকে, ক্ষিধে পায় না। দিনে দুবার ভাত খেতে যা খরচ, দু সন্ধ্যের মালের খরচ তার অর্ধেকের কম। আমরা তাই ভাতের বদলে মাল খাই। ভাত না পাওয়ার কষ্ট ভুলতে মাল…।

ছোলা চিবোতে চিবোতে ঘোঁতন বলল, মাতালের কোনো কষ্ট নেই।

গলা নামিয়ে কমলের তিন সঙ্গী কিছু পরামর্শ করছে। পঞ্চা চুপচাপ, গম্ভীর, কথা বলছে না, কিছু ভাবছে। ঘোঁতন, নাড়ু আর কালু এখন তারাতলায় হাতকাটা শঙ্করের চুল্লুর ঠেকে যাবে। দোকান ছেড়ে যাওয়ার আগে কালু ডাকল, পঞ্চাদা এসো।

পঞ্চা উঠল না। কমলকে কেউ ডাকল না। রতনের ঠেক ছেড়ে তিনজন চলে যাওয়ার মিনিট পাঁচ সাত পরে কমলকে নিয়ে পঞ্চা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ভাঁটিখানার চারপাশে অনেক মানুষ, ভাঙাচোরা, তোবড়ানো তাদের চেহারা, নোংরা উলিঝুলি পোশাক, তবু এই মুহূর্তে তাদের মুখে সীমাহীন সুখ তৃপ্তি, পেট ভরে খাবার পরে যেমন হয়। তারা হাসছে, গান গাইছে, কথা বলছে, চিরিক চিরিক করে থুথু ফেলছে চারপাশে। কমলেরও ক্ষিধে মিটে গেছে। ক্ষিধের নেশা কাটাবার অব্যর্থ দাওয়াইটা জেনে গিয়ে খুশীতে ভরে আছে তার বুক। তারও কথা বলতে, হাসতে, গান গাইতে, থুতু ফেলতে ইচ্ছে করছে। কথা বলার জন্যে, একটা হাসির কথা, পঞ্চার দিকে এগিয়ে গিয়ে কমল ডাকল, পঞ্চাদা…।

কিন্তু হাসির কথাটা বলতে গিয়ে কমলের মাথার ভেতর কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল, বলতে পারল না, হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল।

গলায় বিষাদ পঞ্চা বলল, মাল খেয়ে ক্ষিধে মেটানোর এই মুশকিল, মানুষ হাসতে ভুলে যায়, হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, চল বাড়ী যাই॥

Price : Rs. 15/-
Vol. 9 No. 4
BIVAV
August '86
Reg. No.
R. N. No. 300 17/76

With best compliments of :

45-1062
45-3698
45-0473 (C. E. O.)

M/S Eastern Distilieries Limited

(A Govt. of West Bengal Undertaking)

34, B. L. SAHA ROAD
Calcutta-700 053

"Produces Rectified Spirit For Medicinal & Industrial use. Going ahead for Production of Alcohol from Sugar beet and for Diversified Spirit-Based Products"